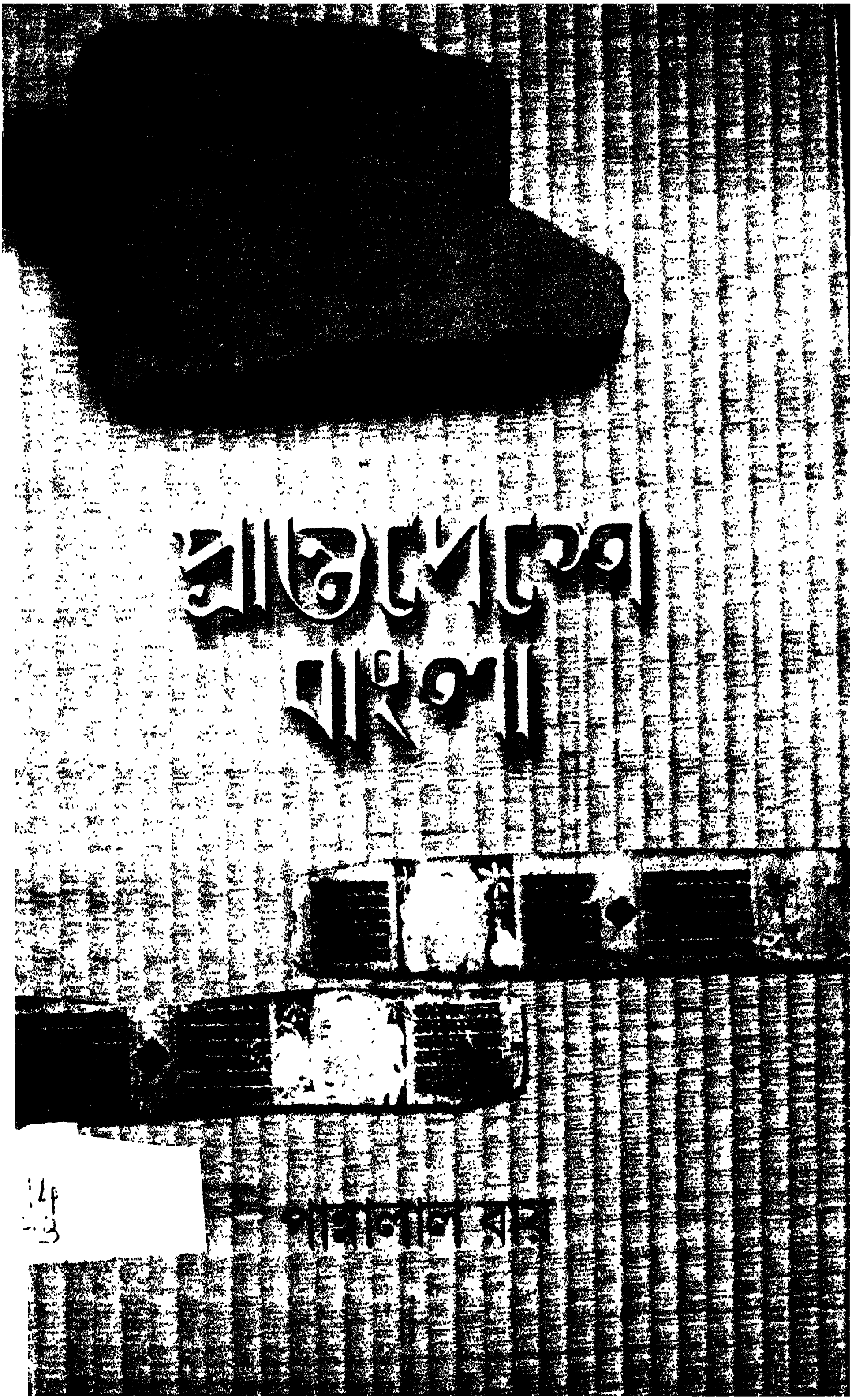

[illegible] বাংলা
পান্নালাল [illegible]

# প্রান্তদেশে বাংলা

পান্নালাল রায়



পারুল প্রকাশনী

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন : ২২৪১ ৬৪৭৪

আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ফোন : ২৩৮৬৯৪৭

PRANTA DESHE BANGLA

*by*

Pannalal Roy



**প্রকাশিকা ঃ**
শ্রীমতী রত্না সাহা
পারুল প্রকাশনী
আখাউড়া রোড, আগরতলা

**প্রথম প্রকাশ ঃ** বইমেলা, ২০০৬

**প্রচ্ছদ ঃ** শিবেন্দু সরকার

**অক্ষর বিন্যাস ঃ**
সাপ্লাই সিন্ডিকেট
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

**মুদ্রণ ঃ**
চৌধুরী অফসেট
১৫/১ ওয়ার্ড ইনস্টিটিউট লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

**মূল্য ঃ** ৮০ টাকা

পিতামহ প্রয়াত প্যারীমোহন রায়
এবং
পিতামহী প্রয়াতা নীরদা দেবীকে

বাংলা মহাভারতচর্চা এবং জয়ন্তিয়ায় বাংলা পুরাণচর্চা প্রান্তীয় বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যন্ত রাজসভাশ্রিত সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে। বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল যথা কোচবিহার, ত্রিপুরা, আরাকান, চট্টগ্রাম, কাছাড় ইত্যাদি বৃহত্তর বঙ্গে বাংলাসাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র রাজসভাশ্রিত সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বাংলায়। সুকুমার সেন ইংরেজিতে আলোচনা করেছেন 'Court Poets of Bengal' গ্রন্থে। এছাড়া পৃথকভাবে কোচবিহার রাজসভার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন অজয় চক্রবর্তী। ত্রিপুরার ভাষা সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন মোহিত পুরকায়স্থ, আরাকান রাজসভার সাহিত্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন এনামুল হক্। প্রত্যন্ত সভাসাহিত্য নিয়ে এইসব গবেষণা এবং আলোচনা সম্ভবত বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রী পান্নালাল রায়কে এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা দিয়েছেন। 'প্রান্তদেশে বাংলা' গ্রন্থে তিনি পূর্বোক্ত আলোচনাগুলিকে আরও তথ্য সম্বলিত করে তুলেছেন। এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন কাছাড় এবং জয়ন্তিয়া রাজসভার পুরাণচর্চার বৃত্তান্ত। দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য বৃহৎ বঙ্গে এদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে তা আরও বিস্তারিত করেছেন বর্তমান গ্রন্থকার। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে একটি করে সুন্দর কাহিনির অবতারণা করে ইতিহাসকে গল্পের মতো রমণীয় করে তুলেছেন। লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্যসমাবেশ গ্রন্থটিকে গবেষণা কর্মের মর্যাদা দান করেছে। সেই সঙ্গে একটু অতৃপ্তির কথাও এইখানে জানাই। প্রান্তদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি মূলত রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু রাজসভার বাইরে প্রান্তীয় বঙ্গে বৃহত্তর জনসভায় যে লোকসাহিত্যেরচর্চা হয়েছিল তাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। এর ফলে 'প্রান্তদেশে বাংলা'র গবেষণাটি কেবল অভিজাত সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে, পূর্ববঙ্গ মৈমনসিংহ গীতিকার মতো সীমান্ত বঙ্গে লোকসাহিত্যচর্চার ধারাটিও প্রান্তদেশে বাংলাচর্চার একটি অঙ্গ। সেই উপেক্ষিত ধারাটিকে নিয়ে যদি তিনি এই গ্রন্থের একটি দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন তাহলে সম্ভবত আলোচনাটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক রূপ লাভ করবে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনার জন্য আমাকে আহ্বান করে আমার উপর যে গুরু দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করার মতো পাণ্ডিত্য এবং ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই। বেশ কয়েকবছর আগে 'রাজসভার কবি ও কাব্য' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করি। সম্ভবত সেই গ্রন্থই এক্ষেত্রে আমার যোগ্যতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়েছে। লেখক গ্রন্থশেষে 'ঋণ-স্বীকার' অধ্যায়ে অন্যান্য বিখ্যাত সব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সঙ্গে আমার গ্রন্থের উল্লেখ করে আমাকেই ঋণী করেছেন। লেখকের সঙ্গে আমার যদিও প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তবু তাঁর স্বীকৃতি আমি কৃতজ্ঞচিত্তে নতমস্তকে গ্রহণ করছি। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনায় আমার ভূমিকা যৎসামান্য, ভূমিকা ব্যতিরেকেই গ্রন্থটি নিজগুণে বুধমণ্ডলীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস, তবু ভূমিকা রচনা সূত্রে লেখকের সঙ্গে আমার মনের যে যোগসূত্র স্থাপিত হল সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র
জোড়াসাঁকো, ঠাকুর বাড়ি
০৫.০১.০৬

# সূচিপত্র

# পাখির পালকের ডগায় ভাসার [illegible]

সূর্য তখন মধ্য গগনে। বিস্তীর্ণ গোচারণভূমির [illegible] হয় বিশাল এক স্থলপদ্ম মেলে ধরেছে তার পাপড়ি। অসংখ্য [illegible] প্রান্তরে কেন এদের বসিয়ে রাখা হয়েছে! একপ্রান্তে বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। তার [illegible] নীচে আশ্রয় নিয়েছে গবাদি পশুও। কিন্তু সুন্দরী কিশোরী মেয়েদের জন্য কেন এই সূর্যস্নান! মেয়েদের মুখ হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ। তবু তারা ভাবলেশহীন। হয়তো তাদের জানা আছে অনিবার্য পরিণতির কথা। কিংবা বুঝে উঠতে পারছে না কিছুই। দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে তারা। আসার পথে অনেক শুনেছে রাজবাড়ির কথা।

অদূরেই রাজপ্রাসাদ। সুউচ্চ প্রাচীর। বিশাল তোরণ। কারুকার্যময় স্তম্ভ। সশস্ত্র সান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে দিবারাত্র। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল দূরাগত কিশোরীরা। দুর্গ বা রাজার বাড়ি কিছুই কোনো দিন দেখেনি তারা। তাই তোরণ পেরিয়ে ভিতরে যেতে যেতে পুলকিত হয়েছিল। কিন্তু রাত্রিটা বিশ্রামের পরই প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে আসা হল এই প্রান্তরে। প্রখর রৌদ্রে বসিয়ে রাখা হল অভুক্ত অবস্থায়। কুমারি মেয়েরা এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত। আকাশে পাখি নেই! বাতাসও যেন স্তব্ধ। স্থির বৃক্ষপল্লব। ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠেছে কিশোরীদের তনু, অঙ্গের বসনও।

সবই রাজার আশ্চর্য খেয়াল। এবার সান্ত্রীরা কুমারীদের নিয়ে গেল রাজপ্রাসাদে। সেখানে রাজা তাঁর পারিষদদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এবার যেন কুমারীদের চরম ভাগ্য পরীক্ষা। তাদের ঘর্মসিক্ত বসন খুলে দেয়া হল রাজাকে। রাজা ঘ্রাণ নিলেন। পরখ করালেন পারিষদদের দিয়ে। তারপব কুমারী তনুর ঘর্মসিক্ত বসন ঘ্রাণের মাধ্যমে রাজা তার পছন্দের কুমারীদের নির্বাচন করে নিলেন। রাজপ্রাসাদে তাদের রেখে দেয়া হল। যথাসময়ে তাদের কৌমার্য হৃত হবে। রাজা এদের ভোগ করবেন।

ইতিহাসখ্যাত পৃথিবী পরিভ্রমণকারী ম্যাগিলনের পোর্তুগীজ সফরসঙ্গী দুয়ার্তে বারবোসা এরকম বলে গেছেন আরাকান সম্পর্কে। ১৫০১ খ্রি থেকে ১৫১৬ খ্রি পর্যন্ত ভারত সফর করেন দুয়ার্তে। সে সময় চট্টগ্রামও ভ্রমণ করেন তিনি। দুয়ার্তে বারবোসা আরাকানকে 'রোছানগো' বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে তদানীন্তন সময়কালে আরাকান রাজ্যে ছিল বারোটি প্রধান শহর। শহরের শাসকগণ প্রতি বছরে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে তাদের এলাকা থেকে বারো বছর পূর্ণ হয়েছে এমন বারো জন কুমারি মেয়েকে নিয়ে যেতেন রাজার কাছে। বর্ণাঢ্য সাজে তাদের সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর পাতলা সাদা পোশাক পরিয়ে তাদের ভোর থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে অভুক্ত অবস্থায় বসিয়ে রাখা হত। পরিধানের সাদা পোশাকে সংশ্লিষ্ট কুমারীর নাম লিখে রাখা হত। একসময় খরতাপে ঘর্মাক্ত হলে ভিজে যেত পোশাক। তখন কুমারীদের শরীর থেকে তা খুলে নিয়ে দেওয়া হত রাজার কাছে। রাজাও তাঁর সভাসদগণ একের পর এক ঘর্মাক্ত বস্ত্রের ঘ্রাণ নিতেন। তারপর যেসব বস্ত্রের ঘ্রাণ রাজার পছন্দ হত সেসব কুমারীদের রাজা নিজের জন্য রেখে দিতেন।

দুয়ার্তে বারবোসার এই আরাকান আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা। হয়তো প্রাচীন এই পাহাড়ি রাজ্যটির পর্বত-কন্দরে লুকিয়ে আছে আরও অনেক কাহিনি। কালের আবর্তে চাপা পড়ে গেছে তা। এমনকি সেসব জানতেও আজ আমরা অনাগ্রহী। কিন্তু এই আরাকান রাজ্যেই ঘটেছে এমন কালোত্তীর্ণ ঘটনা যা আমাদের আজও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। ষোড়শ শতকের যে আরাকানে রাজা ঘ্রাণ নিতেন কুমারী তনুর ঘর্মসিক্ত বসনের, সপ্তদশ শতকের সেই আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সৈয়দ আলাওল রচনা করলেন কালোত্তীর্ণ বাংলা কাব্য 'পদ্মাবতী'। পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি বাংলার প্রতিও যেন এক গভীর মমতা ঝরে পড়ল পাখির পালকের ডগায়।

আলাওল লিখলেন—

"আসিল শরৎ ঋতু নির্ম্মল আকাশে।
দোলায় চামর কেশ কুসুম বিকাশে।।
নবীন খঞ্জন দেখি বড় হি কৌতুক।
উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ।।
সুগন্ধী চন্দনে লেপিয়া কলেবর।
কুসমিত শ্বেতশয্যা অতি মনোহর।।"

শত শত বছর আগে লেখা আলাওলের কাব্য থেকে চোখ তুলে বাইরে তাঁকালেই যেন দেখি—মাটিতে ছড়িয়ে আছে শিউলি। নদী পাড়ে যেন দেখি কাশবনে দোলা। সপ্তদশ শতকেই আরাকান রাজসভারই কবি দৌলত কাজী লিখেছিলেন 'লোর চন্দ্রাণী' বা 'সতী ময়না'। মধ্যযুগের এই রোমান্টিক বাংলা আখ্যানকাব্য যেন আজও আমাদের মুগ্ধ করে—

"কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।।
.......... নির্ম্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান
ভরমে ভ্রমর-পাঁতি ধরএ যোগান।।"

## ২

আশ্চর্য সব কাহিনি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে মূল বাংলা ভূখণ্ড থেকে দূরের আরাকান। দেবদেবীর মহিমা জ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের সমৃদ্ধির যুগে আরাকান রাজসভার কবিরা রচনা করলেন লৌকিক আখ্যানকাব্য। সেই কাব্যে বিমূর্ত হয়ে উঠল মাটির মানুষের কামনা বাসনার কথা। গুরুত্ব পেল পার্থিব মানুষের প্রেম-বিরহ। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় চিহ্নিত হয়ে রইল আরাকান রাজসভার অবদান। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত দৌলত কাজী ও আলাওলের অপূর্ব সৃষ্টির আলোয় আলোচিত যে আরাকান-তার ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত নিশ্চিত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলে, আরাকান ছিল এক স্বাধীন রাজ্য। অধিবাসীরা বেশির ভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও সুপ্রাচীন কালেই আরাকানের সঙ্গে আরব দুনিয়ার

বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে বহু আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল মুসলমান বসতি। পঞ্চদশ শতকে আরাকান গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। আর তার ফলশ্রুতিতে সেখানে মুসলমানদের বসতির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। গৌড় থেকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগণ জীবিকার নানা সূত্রে পাড়ি দেন আরাকান। ভাগ্যের অন্বেষণে আসেন অনেক তুর্কি ও পাঠান যোদ্ধা। আর নৌ বাণিজ্যের সূত্রে আরব দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ তো ঘটেছিল আগেই। এইভাবে নানা সূত্রে বহিরাগতরা বসতি গড়ে তোলেন আরাকানে। পাতেন সংসার। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে অনেকে গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। আবার সুফি দরবেশের প্রচারের মাধ্যমেও ইসলামের প্রসার ঘটে আরাকানে।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম পর্বেই আরাকান কীভাবে গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হল তার পেছনেও রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনি। সিংহাসন নিয়ে রাজবংশের মধ্যে ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা, এমনকি পরস্ত্রী হরণের মতো ঘটনাও জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে।

১৪০২ খ্রিস্টাব্দ। আরাকানের রাজধানী তখন লংগ্রেত। সিংহাসনে রাজা অযুথ। পুত্র নরমিখলা যুবরাজ। একদিন আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল অভ্যুত্থান। রাজার স্বভ্রাতা রাজা অযুথকে হত্যা করে অধিকার করে নিলেন সিংহাসন। পালিয়ে গেলেন যুবরাজ নরমিখলা। সিংহাসন পুনরুদ্ধার আর প্রতিশোধ স্পৃহায় তখন তাড়িত তিনি। দুই বৎসর পর সুযোগ এল। পিতৃব্যকে উৎখাত করে পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করলেন নরমিখলা। কিন্তু তারপরই এক চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনে। এর মূলে ছিল এক রমণী। পরস্ত্রী।

সাবুইউ এক সামন্ত রাজার পত্নী। একদিন নরমিখলার নজরে পড়লেন এই অপরূপা সুন্দরী। হয়তো যুবরাজ কালেই কোনো এক বসন্তে হয়েছিল দৃষ্টি বিনিময়। ঢেউ উঠেছিল হৃদয়ে। কিন্তু এই সুন্দরীতো অননথিউ নামে এক শক্তিশালী সামন্ত রাজার ভগ্নী এবং অপর এক সামন্ত রাজার পত্নী। তাই তাকে পাওয়া তো যুবরাজের দুরাশাই। অবশেষে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর নরমিখলা চাইলেন তাঁর কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে। তিনি পরস্ত্রী সাবুইউকে অপহরণ করে নিয়ে এলেন রাজধানী লংগ্রেত। ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন অন্যান্য সামন্তরাজাগণও। তাঁরা প্রথমে নরমিখলাকে অনুরোধ জানালেন যাতে তিনি পরস্ত্রীকে তাঁর স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ক্ষমতায় মদমত্ত রাজা প্রত্যাখ্যান করলেন তা। অবশেষে ক্ষুব্ধ সামন্তরাজারা ব্রহ্মদেশের রাজার শরণাপন্ন হলেন। আরাকান আক্রমণ করে নরমিখলাকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য তাকে প্রলুব্ধ করলেন তাঁরা। ব্রহ্মরাজ দেখলেন বিরাট সুযোগ। সামন্তগণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছে। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন আরাকান। এইভাবে সামন্ত রাজারা বহির্শক্তিকে ডেকে আনলেন আরাকানে। নরমিখলা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন গৌড়বঙ্গে। রাজধানী গৌড়ে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন তিনি। সেখানে থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকলেন। দিন যায়, বছর যায়। সুলতানের কাছে আবেদন করেন। চিন্তা করেন প্রতিপক্ষ ব্রহ্মরাজের সৈন্য আর অস্ত্রবলের কথা। এইভাবে কেটে গেল চব্বিশটি বছর। অবশেষে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন শাহ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন নরমিখলাকে। নেতৃত্বে ছিলেন গৌড়ের সেনাপতি ওয়ালিখান। শুরু হল আরাকান

উদ্ধারের অভিযান। যুদ্ধে সাফল্য ঘটল গৌড়সৈন্যবাহিনীর। কিন্তু দুর্ভাগ্য নরমিখলার। বর্মীদের হাত থেকে আরাকান উদ্ধারের পর সেনাপতি ওয়ালিখান নিজেই সিংহাসন অধিকার করে বসেন। স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন নিজেকে। ফলে নরমিখলা আবার পালিয়ে আসেন গৌড়ে। সুলতান জালালুদ্দিন শাহ ক্ষিপ্ত হয়ে এবার নরমিখলার সাহায্যে সেনাপতি সিন্ধীখানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী পাঠালেন আরাকান। প্রমাদ গনলেন ওয়ালিখান। আরাকান ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন তিনি। ওয়ালিখানের অনুগত সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলেন সিন্ধীখানের বাহিনীর কাছে। এইভাবে গৌড় সুলতানের সহায়তায় নরমিখলা উদ্ধার করলেন তাঁর পিতৃ সিংহাসন। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ম্রাউক-উ' নামক রাজবংশের। স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদী লেম্ব্রো। এই নদীর তীরে রাজধানী ম্রোহং।

পিতৃরাজ্য আরাকান উদ্ধারে নরমিখলাকে গৌড় সুলতানের সাহায্য কিন্তু নিঃশর্ত ছিল না। গৌড়কে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন নরমিখলা। এইভাবে আরাকান গৌড়ের এক করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং প্রায় শতাব্দীকাল তা অব্যাহত ছিল। আরাকান রাজারা সে সময় তাদের পরম্পরাগত নামের পাশাপাশি মুসলমান নামও ধারণ করতেন। নরমিখলা নাম ধারণ করেছিলেন মোহম্মদ সোলেমান শাহ। গৌড়ের অনুকরণে তখন মুদ্রাব্যবস্থাও চালু হয়েছিল আরাকানে। ঐতিহাসিকগণ জানিয়েছেন, গৌড়ের করদ রাজ্য থাকাকালে এগারোজন রাজা রাজত্ব করেছেন আরাকানে।

একসময় গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে আরাকান। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ। ম্রোহং-এর সিংহাসনে তখন ম্রাউক-উ বংশের দ্বাদশতম রাজা স্বাধীনচেতা মিনবিন ওরফে জেবুক শাহ। গৌড়ও তখন ক্রমেই হীনবল। পতন ঘটেছে স্বাধীন রাজশক্তির। জেবুক শাহ গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে ঘোষণা করলেন আরাকানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে ম্রোহং-এর রাজারা আরাকানের শক্তিবৃদ্ধির যাবতীয় প্রচেষ্টা নিলেন। গৌড়বঙ্গ থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা সৈন্যরা অন্তর্ভুক্ত হল আরাকান বাহিনীতে। রাজসভাতেও উচ্চপদসমূহে গৌড়ের বাংলাভাষাভাষী মুসলমান। এক সময় মুঘল আধিপত্য বিস্তৃত হল গৌড়বঙ্গে। আরাকান রাজারা শঙ্কার চোখে দেখলেন অদূরেই মুঘল প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরে তখন দুর্দান্ত পোর্তুগিজ জলদস্যুর আবির্ভাব ঘটেছে। আরাকানের রাজারা মুঘল শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে এই জলদস্যুদের ব্যবহারের কথা ভাবলেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। জেবুক শাহই প্রথম আরাকানের মগদের নিয়ে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় গড়ে তুললেন এক নৌবাহিনী। কিন্তু নৌযুদ্ধের তালিম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সঙ্গে থেকে মগবাহিনীও ক্রমেই জলদস্যু হয়ে ওঠে। তারা মেঘনা নদীর তটভূমি জুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব শুরু করে এক সময়। গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করে দেয়। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড সহ নারীপুরুষ নির্বিশেষে বহু সংখ্যক মানুষকে তারা ধরে নিয়ে যায় আরাকানে। সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হয়। আরাকানের টিলাটক্কর পাহাড়ি জমিকে কৃষিযোগ্য করে গড়ে তোলায় কাজে লাগানো হয় সেই সব মানুষকে। তাদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। এই ভাবেই এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের হতভাগ্য মানুষদের বসতি গড়ে উঠে আরাকানে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী

অঞ্চলসমূহে সেদিনকার জলদস্যুদের তাণ্ডব যেমন আজ করুণ ইতিহাস হয়ে আছে, তেমনি অবাক হলেও এটা ঘটনা যে, বাংলাসাহিত্যের চর্চা আর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে সেদিনের আরাকান রাজসভা। আরাকানকে বাদ দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রয়েছে আরাকানের ইতিহাসের উপাদানও।

'পদ্মাবতী'র কবি সৈয়দ আলাওল একদা জলপথে পোর্তুগিজ জলদস্যুর কবলে পড়েছিলেন। নিজে রক্ষা পেলেও দস্যুর আক্রমণে মৃত্যু ঘটে কবির পিতার। আলাওল আরাকান রাজের ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে চাকরি নেন। পাশাপাশি চলতে থাকে কাব্যচর্চা। একদিন রাজসভার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা। কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন রাজসভার অমাত্য। তাঁর অনুরোধে আলাওল রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। এমনকি মাগন ঠাকুর নিজেও ছিলেন কবি। সুবিখ্যাত কাব্য 'চন্দ্রাবতী' তাঁর সৃষ্টি। শুধু নিজের কাব্য রচনাই নয়, সেদিন বাংলাসাহিত্য চর্চায় রাজসভার পক্ষে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তিনি বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। আলাওলের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি 'পদ্মাবতীর' সঙ্গেও জড়িয়ে আছে মাগন ঠাকুরের নাম। কিন্তু কেমন ছিলেন সেই মাগন ঠাকুর? 'পদ্মাবতী'র কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে লিখেছেন—

"দূর্ব্বাদল-শ্যাম-তনু, মুখ পূর্ণচন্দ্র।
দেখিয়া সুহৃদজন হৃদয় আনন্দ।।....."

মাগন ঠাকুরের সম্যক পরিচয় দিতে গিয়ে কবি আরও লিখেছেন—

"কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথে
এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে
মহাসত্য মোসলমান সিদ্দিকের বংশে
নানাগুণ পারগ সে হন্ত কুলীন
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিলি।"

আরাকানরাজ নরপদিগ্রীর অমাত্য ছিলেন মাগন ঠাকুর। রাজার ছিল এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। বৃদ্ধাবস্থায় রাজা চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। কার হেফাজতে রেখে যাবেন রাজ্য আর রাজকন্যা! অবশেষে মাগন ঠাকুরের উপর রাজকন্যার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল। রাজারই ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমিন্তারের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল রাজকন্যার। নরপদিগ্রীর মৃত্যুর পর জামাতা থদোমিন্তার বসেন সিংহাসনে। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে থদোমিন্তারের মৃত্যুর পর সংকট নেমে আসে রাজ্যে। উত্তরাধিকারী প্রয়াত রাজার শিশুপুত্র। প্রাসাদের অলিন্দে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের সুতীব্র ফণা। রাজ্য চলবে কী ভাবে? অবশেষে মাগন ঠাকুরকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে রানি রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এইভাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাগন ঠাকুর আরাকান রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

কোরেসী মাগন ঠাকুরের পিতা বড়ো ঠাকুর প্রথমে রাজা থ্রি থুধম্মার সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে ছিলেন এবং পরে রাজা নরপদিগ্রীর অমাত্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আরাকানেও রাজসিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র, হত্যা, রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান প্রবল ছিল একদা। রাজা থ্রি থুধম্মা এক

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিল। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে নরপদিগ্রী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাজা থ্রি থুধম্মাকে হত্যা করে আরাকানের সিংহাসনে বসেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকান উল্লিখিত হয়েছে রোসাঙ্গ হিসাবে। রোসাঙ্গ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ নানারকম মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোয়াং, তারপর রোহাংগ এবং তা থেকে রোসাংগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার বাঙালি কবিগণ আরাকানকে 'রোসাঙ্গ' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন দৌলতকাজী তাঁর 'সতী ময়না'তে লিখেছেন—'কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী, রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকান বা রোসাঙ্গ কেন উজ্জ্বল হয়ে আছে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। বস্তুত গৌড়ের করদ রাজ্য হিসাবে পরিণত হবার পরই আরাকানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের সংস্রব ঘটে। সৈন্যবাহিনী সহ রাজসভার উচ্চপদে বাংলাভাষাভাষীরা অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। তাদের মাধ্যমেই বাংলাভাষার প্রতি আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন হবার পর ষোড়শ শতকে গৌড়বঙ্গ থেকে সমরকুশলী ও রাষ্ট্রকুশলীরা আরাকানে আসতে থাকেন এবং রাজার সমাদরও লাভ করেন। রাজসভা এবং রাজার সৈন্যবাহিনীতে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি বাড়তে থাকে। বলাই বাহুল্য, তদানীন্তন সময়ে আরাকান রাজসভার প্রভাবশালী পুরুষদের কারো কারো বাংলার প্রতি অনুরাগ, কাব্যানুরাগ পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে দৌলত কাজী, আলাওল কিংবা নসরুল্লা খান প্রমুখকে। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, গৌড়ের পতনের পর রোসাঙ্গ রাজসভাই হয়ে পড়েছিল বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র।

দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "পূর্ববঙ্গের সুদূরে চট্টগ্রাম সন্নিহিত আরাকান রাজ্যে বৌদ্ধ রাজদরবারের ভাষা ছিল বাঙ্গলা ভাষা। যাঁহারা বৌদ্ধ রহিলেন এবং যাঁহারা মুসলমান হইলেন, তাঁহাদের উভয় শ্রেণীরই মাতৃভাষা ছিল বাঙ্গলা ভাষা। .......... আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আরাকানের মগরাজা এবং তাহাদের মুসলিম অমাত্যগণ সকলেই এই বাঙ্গলা ভাষাকে 'দেশী ভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কি এই অনুমান হয় না যে, আরাকানের প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা যাহাই থাকুক না কেন, সে দেশের লিখিত ভাষা ছিল বাঙ্গলা।......" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান/রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে আরাকানের ইতিহাস যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ রাজাদের আরাকান রাজসভায় বাংলা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় রাজনৈতিক নানা উত্থানপতন, যুদ্ধবিদ্রহ, বাংলাভাষাভাষীদের বসতি স্থাপন, রাজসভায় উচ্চপদলাভ ইত্যাদি বিষয় চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলার প্রতি বৌদ্ধ রাজাদের ঐকান্তিক আগ্রহ অনুরাগও এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রাজার সমর্থন কিংবা আগ্রহ না থাকলে, বাংলাভাষাপ্রেমী অমাত্যগণ 'সতী ময়না' কিংবা 'পদ্মাবতী' রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারতেন না।

সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বে আরাকান রাজার সেনাপতি লস্কর উজির আশরাফ খানের নির্দেশে

দৌলতকাজী রচনা করেন 'সতী ময়না বা লোর চন্দ্রাণী।' 'ঠেঠ হিন্দি ভাষায় রচিত এক কাহিনির অনুবাদ করেন তিনি। লস্কর উজির আশরাফ আদেশ করেন দৌলত কাজীকে—

"ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে।
না বোঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে বুঝিয়া যেন পড়এ সানন্দে।।"

এখানে 'দেশী ভাবে' বলতে বাংলা ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে! অর্থাৎ বাংলাই ছিল আরাকানের সাধারণ্যে বোধগম্য ভাষা। যাই হোক. তার প্রায় তিন দশক পর রাজসভার অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে সৈয়দ আলাওল রচনা করেন 'পদ্মাবতী'। হয়তো এজন্যই দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—"আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা এই ভাষায় নানা ভাষা হইতে কাব্যাদির অনুবাদ করাইয়া ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাকে সার্বভৌমিকত্ব দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বতীর্থের জল দিয়া এই ভাষা-লক্ষ্মীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। আরাকানের রাজদরবার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান বিরচিত বাঙ্গালা কাব্যের অন্যতম মুখ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।....." (প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান)

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আরাকান রাজার রাজসভায় কীভাবে কালক্রমে বাংলা ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হল তার তথ্য ছড়িয়ে আছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পোর্তুগিজ দস্যুদের কবলে পড়ে পিতৃহারা আলাওল আরাকান রাজার ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলেন। রোসাঙ্গ রাজসভার অপর এক প্রতিভাবান বাঙালি কবি নসরউল্লাহ খান অষ্টাদশ শতকে রচনা করেছিলেন 'শরিয়তনামা।' কবি তাঁর কাব্যে নিজবংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁর অষ্টম পূর্ব পুরুষ হামিদুদ্দিন গৌড়ের প্রধান উজির ছিলেন। এই উজিরপুত্র বুরহানউদ্দিন একদা বিপদে পড়ে ভাগ্যান্বেষণে অনেক অনুচরবর্গ সহ রোসাঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। আরাকানরাজ রাজ্যের লস্কর উজির পদে নিয়োগ করেন বুরহারউদ্দিনকে। তিনিই নাকি প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবর্তন করেন সেখানে। পরবর্তী সময়ে বুরহানউদ্দিনের অধস্তন পুরুষ অর্থাৎ কবি নসরউল্লাহের পূর্বপুরুষগণ রোসাঙ্গ রাজসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। জীবিকার নানা সূত্রে এবং ভাগ্যান্বেষণে তৎকালীন গৌড় থেকে আরাকানে যাওয়ার যে একটা প্রবণতা ছিল উপরোক্ত ঘটনা সমূহ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। (রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস/এন. এম. হাবিবউল্লাহ)।

৩

আরাকানে বাঙালি বসতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্য চর্চায় রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কিত। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই সেখানে গড়ে উঠেছিল বাঙালিদের বসতি। তবে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে। পঞ্চদশ শতকে আরাকান যখন গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হয় তখন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় দুই রাজ্যের মধ্যে। গৌড় থেকে ভাগ্যান্বেষণে

অনেকে এসে জড়ো হতে থাকেন আরাকানে। কেউ কেউ সেনাবাহিনীতে, রাজসভায় চাকরি সংগ্রহ করে নেন। তাদের মধ্যে কেউ আবার উচ্চপদও লাভ করেন।

১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের সহয়তায় নরমিখলা আরাকানের সিংহাসনে বসার পর থেকেই আরাকান গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। আরাকানের রাজারা তখন গৌড়ের অনুকরণে মুদ্রার প্রচলন করেন। এই সময় থেকে আরাকানের রাজারা তাদের বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে থাকেন। মুদ্রার এক পিঠে রাজার বৌদ্ধনাম, উপাধি বর্মী ভাষায় এবং অপর পিঠে রাজার একটি মুসলমানি নাম, উপাধি আরবি ভাষায়, কোনো মুদ্রায় আবার বাংলা ভাষায় ও অক্ষরে উৎকীর্ণ থাকত। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই শতাধিক বছর এই নিয়ম চালু থাকে। অর্থাৎ আরাকান গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করার দীর্ঘ দিন পরও তাদের মুদ্রায় রাজার মুসলমানি নাম ব্যবহার করেছে। মুদ্রায় আরবি বা বাংলা লিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

যাই হোক, গৌড়ের পতনের পর আরাকান যখন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখনও সেখানে গৌড়দেশের মানুষের আগমন অব্যাহত থাকে। গৌড়ের প্রাক্তন রাজকর্মচারীদের অনেকেই আরাকানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ছাড়াও অন্য একভাবে বাঙালিদের বসতি গড়ে উঠেছিল আরাকানে। সে বড় করুণ কাহিনি।

মুঘল শক্তির অভ্যুদয় এবং পূর্ব দিকে তাদের আধিপত্য বিস্তারে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন আরাকান রাজা। ঘাড়ের উপর যেন তপ্ত নিঃশ্বাস। বঙ্গাদেশ পার হয়ে মুঘল শক্তি একদিন হানা দিতে পারে আরাকানেও! এই শঙ্কা থেকে সাবধানী হলেন তাঁরা। মুঘলদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ আরাকানরাজ তাঁর বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিলেন। চিন্তা করলেন শক্তিশালী নৌবাহিনীর। বঙ্গোপসাগরে তখন দুর্ধর্ষ পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আবির্ভাব ঘটেছে। আরাকান রাজা জেবুক শাহ পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় মগদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক শক্তিশালী নৌবাহিনী। মগদের নৌসেনা হিসাবে গড়ে তোলা অর্থাৎ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল পোর্তুগিজদের উপর। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যুদ্ধের তালিম নেবার পাশাপাশি মগগণ পোর্তুগিজদের সঙ্গে থেকে দস্যুবৃত্তিতেও পারদর্শী হয়ে ওঠে। শুধু জলপথেই দস্যুতা ও লুণ্ঠন নয়, কালক্রমে মগবাহিনী নিম্নবঙ্গের তটভূমিসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব শুরু করে। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যার পর তারা মানুষ ধরে নিয়ে যেতে শুরু করে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে তারা ধরে নিয়ে যায় আরাকান। সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইসব মানুষ। আরাকানের জঙ্গল পরিষ্কার, টিলাটক্কর কেটে কৃষিযোগ্য ভূমি তৈরি ইত্যাদি কাজে লাগানো হয় তাদের। নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। নারীদের প্রতি দস্যুদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। এইভাবে জলদস্যুদের তাণ্ডবে একদা বঙ্গাদেশের নিম্নাংশে নেমে এসেছিল শ্মশানের স্তব্ধতা। এইসব করুণ কাহিনি ছড়িয়ে আছে বাংলার অনেক লোকগীতিতেও। কিন্তু দস্যুদের এরকম নিষ্ঠুর তৎপরতার মধ্যেও আশ্চর্য সত্য হল—ক্রীতদাস হিসাবে মানুষ ধরে আনার ফলশ্রুতিতে কালক্রমে আরাকানে বাঙালি বসতির আরও বিস্তার ঘটেছে। নদী মাতৃক বাংলার কোমল ভাষার প্রতি পাহাড়ি রাজ্যের শাসককুলের অনুরাগও যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত প্রত্যক্ষ করেছে সপ্তদশ

ও অষ্টাদশ শতকের আরাকান। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"........ রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইলে আরাকানী মগেরা পর্ত্তুগীজ হার্মাদদের সঙ্গে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ লুঠ করিত। সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যাদের প্রতি তাহাদের লোলুপ-দৃষ্টি বেশী পড়িত এবং হতভাগিনীদিগকে সহস্র সহস্র সংখ্যায় লুণ্ঠন করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইত। ভদ্র এবং ইতর শ্রেণীর শত শত মহিলার আর্তনাদে পূর্ব্ববঙ্গ একসময়ে মুখরিত ছিল। তাহাদের বিলাপ ও স্বামীর উদ্দেশ্যে করুণ-নিবেদন-জ্ঞাপক বাঙ্গালা ছড়া আমরা অনেকগুলি পাহিয়াছি। বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'মগী ব্রাহ্মণ' বলিয়া এক শ্রেণির ব্রাহ্মণ আছে। মগদের সংশ্রবে এবং তাহাদের মহিলাদের বিড়ম্বনায় সেই সকল ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হইয়া আছে। শুধু ব্রাহ্মণ নহে, অপরাপর শ্রেণীর মধ্যেও মগদোষ-দুষ্ট পরিবারের অভাব নাই। এই মহিলারা আরাকানে নীত হইলে তাহাদের সংশ্রবে মগদের বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞান ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই।" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান)

বঙ্গাদেশের নদীপথে মগ দস্যুদের উপদ্রব অবশ্য আগে থেকেই ছিল। হুগলি নদীপথে তারা নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে হানা দিত। তাদের প্রতিরোধে হুসেন শাহ্ একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। শায়েস্তা খান রূপনারায়ণের উজানে একটি দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। যাই হোক, মুঘল আধিপত্যের যুগে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় মগরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মুঘলদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আরাকান রাজা পোর্তুগিজদের সহায়তায় শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সম্ভবত সেই সূত্রে মগদের দস্যুবৃত্তিও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। প্রসার ঘটেছিল দাস বাণিজ্যের। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁর ভাইসরয় কাশিম খান পোর্তুগিজদের ব্যান্ডেল তথা হুগলি নদীতে তাদের দাসবাণিজ্য কেন্দ্র থেকে উৎখাতে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। পোর্তুগিজরা সম্রাট আকবরের কাছ থেকে একটি ফরমান লাভ করে সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। মগদের কাছে তারা বাঙালি দাস বিক্রি করত। ঐতিহাসিকগণ অবশ্য বলেছেন যে, অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির দস্যুরাও জলপথে দস্যুতা ও দাস বাণিজ্যের জন্য অপরাধী, কিন্তু কূটনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে শুধু পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধেই মুঘলশক্তি ব্যবস্থা নিয়েছিল। এমনকি, শাহজাহানের আগে সম্রাট জাহাঙ্গিরও পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগিজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সুনজরে দেখেন নি।

নদীমাতৃক বঙ্গ দেশে অবশ্য জলদস্যুদের তাণ্ডব স্মরণাতীত কাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন চর্যাগীতিতেও তার প্রমাণ বর্তমান। জলদস্যুদের আক্রমণ এবং স্ত্রীলোক অপহরণ ও জাতিচ্যুতির কথা উল্লিখিত আছে চর্যাপদে। এখানে উল্লেখ করা যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চর্যাপদের দুটি ছত্র— "আজি ভুসুক বংগালী-ভঈলী।
নি অ ঘরিনি চণ্ডালে লিলি।"

(Magh Raiders in Bengal / Jamini Mohan Ghosh) ৯

নিম্নবঙ্গে জলদস্যুদের তাণ্ডব, দাসবাণিজ্য, আরাকানে বাঙালি বসতি বিস্তার ইত্যাদির পাশাপাশি রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা কাব্যের বেগবান প্রবাহ যেমন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৌতূকহলোদ্দীপক ঘটনা, তেমনি, গদ্য সাহিত্যেও রয়েছে চমকপ্রদ অধ্যায়। বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের অধ্যায়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ।'

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তা রচিত হয়েছিল বলে বিশ্বাস। রচনা করেছিলেন ধর্মান্তরিত এক বাঙালি রাজপুত্র-ভূষণার দোম আন্তোনিয়োর। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাল্য বয়সে ভূষণার এই রাজপুত্র মগ জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন। অপহরণের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আরাকানে। ফাদার মানোএলদের রোজারিও নামে একজন সেন্ট অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্ম যাজক সেখানে তাঁকে উদ্ধার করেন। তারপর এই রাজপুত্রকে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। নামকরণ হয় দোম আন্তোনিয়োর। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা গদ্যে রচনা করেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। এতে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খ্রিস্টমহিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেই প্রাচীন গদ্যের রূপটি খানিকটা উল্লেখ করা যায়—"ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাজ্কিতে লওয়াএ।" (সূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—গদ্যের প্রথম যুগ / সজনীকান্ত দাস / মিত্রালয় / কলকাতা)

যদিও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হয়েছিল, তবু, বাংলা গদ্যের সূচনালগ্নের এই উদ্যোগ নিশ্চিত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্তুগিজ প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসাবেই তা বিশ্লেষণ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ। যেমন বাংলা গদ্যে রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল পোর্তুগালের লিসবন শহরে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ই প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। যার হরফ ছিল রোমান, মুদ্রণ হয়েছিল লিসবনে, গ্রন্থকার হলেন পোর্তুগিজ পাদরি মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ, কিন্তু ভাষা ছিল বাংলা। অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যের ধারায় উজ্জ্বল হয়ে আছে এই পুস্তক। হয়তো সেদিন বিদেশিদের এ ধরনের উদ্যোগের মূলে ছিল ধর্ম বিস্তারের প্রয়াস, কিন্তু তাদের এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বাংলাগদ্যের সূত্রপাত ঘটেছে।

ভূষণার রাজপুত্রের ঘটনাও যেন এক চমকপ্রদ উপাখ্যান। মগ জলদস্যুদের নিষ্ঠুর কাণ্ডকাহিনি আজও দুঃসহ স্মৃতি হয়ে আছে। কিন্তু এই দস্যুদল কর্তৃক অপহৃত এক রাজপুত্রের আঙুলের ডগায় পরবর্তীকালে সৃষ্টি হল ইতিহাস। শত শত বছর আগেকার এই উদ্যোগ আরও শত শত বছর পরেও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এক অপরিহার্য দিশারি হয়ে থাকবে।

যাইহোক, গদ্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনার আগে আবার পদ্য প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই সাহিত্যের সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের জন্ম পরে। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

## ৪

সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে, ১৬২২-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজী রচনা করেছিলেন তাঁর অনবদ্য কাব্য লোরচন্দ্রানী বা সতী ময়না। এখন পর্যন্ত কবির একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। রোসাঙ্গ রাজার সমর সচিব লস্কর উজির আশরাফ খানের নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজী এই কালোত্তীর্ণ কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কাব্যগ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। দৌলতকাজীর মৃত্যুর ৩০ বছর পর কবি আলাওল এই কাব্যের বাকি অংশ রচনার কাজ সমাপ্ত করেছিলেন।

এটি একটি রোমান্টিক আখ্যান কাব্য। গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় মিয়া সাধনরচিত এক প্রেমকাহিনিকে

বাংলায় রচনা করেন দৌলতকাজী। বিহার, উত্তর-ভারত এবং দক্ষিণাঞ্চল সহ ভারতের সর্বত্র তখন লোকসমাজে সতী ময়নার কাহিনি প্রচলিত ছিল। 'দেশি ভাবে', 'পাঞ্চালীর ছন্দে' সকলের বোঝার সুবিধার জন্য তা রচনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কবি দৌলতকাজীকে। এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, এখানে 'দেশিভাবে' বলতে বাংলা ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে। রোসাঙ্গ রাজসভার নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজী তারপর বাংলাতে রচনা করেন এই অপূর্ব প্রেমোপাখ্যান কাব্যটি।

গোহারী দেশের রাজার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণী। কিন্তু তার স্বামী নপুংসক। একদিন চন্দ্রাণীর পরিচয় হল এক বীর রাজপুত্র লোরের সঙ্গে। দুজনেই দুজনের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন। একদিন লোর নিজ স্ত্রী ময়নামতীকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন চন্দ্রানীকে নিয়ে। পালিয়ে যাবার পথে চন্দ্রাণীর নপুংসক স্বামীর সঙ্গে সংঘর্ষ হল লোরের। নিহত হলেন চন্দ্রাণীর স্বামী। এদিকে দুঃখকষ্টে দিন কাটে ময়নার। লোরের সতীসাধ্বী স্ত্রী ময়না স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতার পূজা দেন। প্রতিবেশী এক রাজপুত্র ময়নাকে কামনা করেন। কিন্তু সেই মনস্কামনা অপূর্ণ থাকে। দৌলতকাজী কাহিনি কাব্যটির এ পর্যন্ত লিখে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় আলাওল সংযোজন করেন—দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোরের প্রথমা স্ত্রী ময়নামতীর কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা। সখীর কাছে ময়না আর এক দুঃখের কাহিনি শোনেন। অনেকটা তাঁর মতোই। ধর্মবতী নগরীর রাজা উপেন্দ্রদেব স্ত্রী রতনকণিকাকে গর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর রতনকণিকা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে জন্ম দেন এক পুত্র সন্তানের। সেই শিশু একদিন বড়ো হয়ে পিতার খোজে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত পিতাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ময়নামতী ধর্মবতীর এই কাহিনি শুনে যেন প্রেরণা পেলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন স্বামী লোরের কাছে। অবশেষে লোর চন্দ্রাণীকে নিয়ে ফিরে এলেন প্রথমা স্ত্রী ময়নামতীর কাছে। সতীনকে নিয়ে সুখে শান্তিতেই দিন কাটে ময়নামতীর। একদিন লোরের মৃত্যু হলে সহমৃতা হলেন দুই স্ত্রী।

দৌলত কাজীর কাব্যের নমুনা এরকম—

"কী কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।।
কাঞ্চন-কমল-মুখে পূর্ণশশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে।।
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্কশরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।।........"

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দৌলত কাজীর এই কাব্যকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ এক দিকচিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর আগে কবিগণ স্বর্গের দেবদেবী নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। মর্তের মানুষ তাঁদের রচনায় স্থান পায়নি। কিন্তু দৌলতকাজীই প্রথম লৌকিক বিষয়কে প্রাধান্য দিলেন, পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে তিনি উপহার দিলেন লৌকিক প্রেমোপাখ্যান। এই যেন প্রথম কাব্যে ভেসে উঠল মাটির মানুষের প্রেম বিরহ-সুখ-দুঃখ। এ জন্যেই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, দৌলত কাজীর কাব্য

একটি দিকচিহ্ন। এই কাব্য বিশ্লেষণ করে পরবর্তী সময়ের পণ্ডিতগণ কাজীর ছন্দমাধুর্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণে তাঁর বিপুল জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, কাব্যের কোনো কোনো অংশে তিনি জয়দেব ও বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে ব্রজবুলিতে লেখা পদের নমুনা—

"শাওন গগনে সঘনে ঝরে নীর।
তঞিও আগুন জুরাএ এ তাপ শরীর।।
মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনু বাসহি বিহি ভেল মোর।।
মদন আসক জিনি রিজুরীর রেহ।
থরকায় রজনী কম্পএ দেহ।...."

আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—"আরাকানের এই মগের মুলুকেও চৈতন্য দেবের খোলকরতা'লের ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়া ছিল। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলির সুরটি যেখানে বঙ্গ ভাষাভাষী লোক ছিল, সেখানেই লোকের কানে বাজিয়া তাহাদিগকে আবিষ্ট করিয়াছিল। ...... অনেক কবি আরাকান রাজসভায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে পদ-রচনা করিয়াছিলেন।....." (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান)

কবি দৌলতকাজী বাংলায় মহাভারতকার কাশীরাম দাসের প্রায় সমসাময়িক। বর্ধমানের সিঙ্গি গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে কাশীরামের জন্ম। কাশীরামের মহাভারতকে অনেকটা মৌলিক সৃষ্টির কৃতিত্ব দিয়েছেন পণ্ডিতগণ। তা ব্যাসের মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ নয়। দেশ ও সমাজের কাছে অধিকতর উপযোগী করে বাঙালি মানসে উপযুক্ত ভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য। গ্রহণ বর্জন করেছেন প্রাচীন কাহিনির। বর্ধমানে বসে কবি কাশীরাম দাস যখন ভীমের পরাক্রম বর্ণনা করেন এইভাবে "মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়।।", তখন আরাকান রাজসভার প্রায় সমসাময়িক কবি দৌলত কাজী চন্দ্রাণীর রূপবর্ণনা করেন এইভাবে—"সুবর্ণ কণিকা কর্ণে মাণিক্য নূপুরে। দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রমার কোরে।। নির্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান। ভরমে ভ্রমর-পাঁতি ধর এ যোগান।।"

সম্ভবত দীনেশচন্দ্র সেন এ জন্যেই বলেছেন—"এই বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য এক পরিবারভুক্ত, ভাষা ও ভাবে নাফ্ নদীর তীর ও ভাগীরথী-কূল একই জ্ঞাতিত্বের চিহ্ন বহন করে।" দীনেশবাবু আরো লিখেছেন—"বৌদ্ধ পাল রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বাঙ্গালার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য যাভা, বালি প্রম্বনম্ ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।....." (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান)

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে আরাকান রাজ্যে বাঙালিদের বসতি পত্তন, বসতির বিস্তার, বাংলা ভাষার প্রতি রাজাদের অনুরাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অনুরাগ আর পৃষ্ঠপোষকতা এক কথা নয়। যদি আরকান রাজাদের সায় না থাকত তবে রাজসভার বাংলা ভাষাভাষী অমাত্য কিংবা সেনাপতির পক্ষে বাংলায় কাব্য রচনার পৃষ্ঠপোষকতা মোটেই সম্ভব

হত না। কবি দৌলতকাজী কিংবা সৈয়দ আলাওল রাজসভায় সম্মানের আসনও লাভ করতে পারতেন না। সেজন্যই বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সর্বোপরি ভারতের নানা ভাষার মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টার পরিচয়ও যেন পাওয়া যায় রাজসভার উদ্যোগের মধ্যে। ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হিন্দি লোককাব্যের বাংলা অনুবাদ কর্মের জন্য রাজসভা থেকে কবিদের অনুরোধ করা হয়। কবিগণও পরম মমতায় তা সম্পাদন করেন। ডঃ এনামুল হক্ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্যে" বলেছেন, "রোসাঙ্গের রাজসভার কবিরা বাঙ্গালা কবিতাকে শুধু বাঙ্গালার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাদেশিক দূর করিয়া হিন্দুস্তানের সকল দেশের ভাষার সঙ্গে সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

সতী ময়না বা লোর চন্দ্রাণী কাব্যে কবি দৌলত কাজী তাঁর আত্মপরিচয় দেন নি। তবে কবি রোসাঙ্গরাজাদের প্রশস্তি গেয়েছেন। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। রোসাঙ্গ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর পূর্বে অবস্থিত—এই বর্ণনায় মনে হয় কাজী চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কবি তৎকালীন সময়ের রোসাঙ্গ রাজার নাম উল্লেখ করেছেন শ্রীসুধর্মা। কবি লিখেছেন—"কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী। রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি।। তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।...."

এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আরাকানের বৌদ্ধরা 'মগ' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের অনেকের অভিমত হল যে, মগধ শব্দটি থেকেই এসেছে 'মগ' শব্দ। রোসাঙ্গ রাজসভার কবিরা অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন মগ ও মগধ শব্দ। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, ব্রাহ্মণ্য শক্তির অত্যাচারে মগধ থেকে 'মগ' সম্প্রদায় আরাকানে পালিয়ে আসেন। কবি দৌলত কাজী আরাকান অর্থাৎ রোসাঙ্গাকে অতি শক্তিশালী দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কবির বর্ণনায় রাজার দেড় সহস্র হাতি ছিল। ছিল 'অযুতে অযুতে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা।' (রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস)।

৫

রোসাঙ্গ রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। কেউ বলেছেন কবির জন্ম চট্টগ্রামে। কেউ আবার বলেছেন ফরিদপুর। দৈব দুর্বিপাকে রোসাঙ্গ রাজার ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে চাকরি করতে হয়েছিল কবিকে। আলাওলের কবি প্রতিভা একদিন রাজসভার পদস্থ কর্মচারীদের মুগ্ধ করে। কবির অন্যতম গুণমুগ্ধ ছিলেন আরাকানের প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুর। এছাড়াও রাজার অর্থমন্ত্রী সুলেমান, পণ্ডিত মুসা, এমনকি স্বয়ং রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মাও কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আলাওলের 'পদ্মাবতীর' সূত্রে অমর হয়ে আছেন মাগন ঠাকুরও। রোসাঙ্গের এই প্রধান অমাত্য নিজেও নাকি ছিলেন একজন কবি ও কাব্যরসিক। 'চন্দ্রাবতী' তাঁর রচিত কাব্য। মাগন ঠাকুরের অনুরোধ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল সৃষ্টি করেন 'পদ্মাবতী'। হিন্দি সাধক কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সী রচিত 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলায় 'পদ্মাবতী'। ষোড়শ শতকের প্রথম পর্বে, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের রাজত্বকালে জায়সী 'পদুমাবৎ' রচনার কাজ করেন। দিল্লির পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও চিতোরের রানি

পদ্মিনীকে নিয়ে এক সময় উত্তর ভারতে নানা লোক কাহিনি প্রচলিত ছিল। পদ্মিনীকে দেখতে চেয়েছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি। চিতোরের রানা দেখিয়েছিলেন দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব ফেলে। আবার কেউ বলেছেন, মস্‌লিনের পর্দার ভিতর থেকে দেখানো হয়েছিল পদ্মিনীকে। কিন্তু তাই দেখেই অধীর হয়ে উঠেছিলেন সুলতান। এই অপূর্ব সুন্দরী রাজপুত রমণীকে তাঁর চাই। চিতোরের রানাকে বন্দি করে আলাউদ্দিন বার্তা পাঠালেন একমাত্র পদ্মিনীকে তাঁর হাতে তুলে দিলেই রানাকে তিনি মুক্তি দেবেন। পরদিন বহু সংখ্যক পালকি হাজির সুলতানের শিবিরে। সুলতানি সৈন্যরা ভাবল রানার মুক্তির জন্য পালকিতে পদ্মিনী সহ রাজপুত রমণীদের নিয়ে আসা হয়েছে আলাউদ্দিনের কাছে। কিন্তু বেশি কিছু ভেবে ওঠার আগেই পালকি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজপুত সৈন্য। তারা মুক্ত করল রানাকে। তারপর বিরাট যুদ্ধ হয়েছে। চিতোরের পতন ঘটেছে। কিন্তু আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে পান নি। বহু সংখ্যক রাজপুত রমণীকে নিয়ে পদ্মিনী জহরব্রত পালন করে আগুনে জীবন উৎসর্গ করেন। চতুর্দশ শতকের এই করুণ কাহিনি দীর্ঘদিন মানুষের হৃদয় সিক্ত করে আসছিল হিন্দি বলয়ে। তাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক লোককাহিনি। ঘটনার প্রায় দুশো বছর পর হিন্দি ভাষার কবি মহম্মদ জায়সী পদ্মিনীর করুণ ঘটনাকে ভিত্তি করে রচনা করেন "পদুমাবৎ"। দিল্লির মস্‌নদে তখন শেরশাহ। 'পদুমাবৎ' কাব্যটি ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দীর্ঘদিন তা প্রচলিত ছিল বলে সহজেই ধারণা করা যায়। পূর্ব প্রান্তের সুদূর আরাকানেও তা পৌঁছে গিয়েছিল এবং রাজসভার কাব্যানুরাগীদের নিশ্চিত প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার বিষয়বস্তু। স্থানীয় কাব্যানুরাগীদের রসাস্বাদনের জন্য রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল তাই বাংলায় রচনা করলেন পদ্মাবতী।

তবে পন্ডিতগণ বলে গেছেন, আলাওলের পদ্মাবতী অনুবাদ কর্ম নয়। রোমান্টিকতা ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাঙালির জীবন-মানসে যেন কবি সৃষ্টি করেছেন 'পদ্মাবতী।' বাংলার চিরন্তনী মাধুর্য ধরা পড়েছে তাঁর কাব্যে। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনও আলাওলের এই অমর কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৯৪৭ হিজরি অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মালিক মুহম্মদ জায়সী তাঁর 'পদুমাবৎ' কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তার শতাধিক বছর পর, ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে আলাওল রচনা করেন 'পদ্মাবতী'। আলাওল তখন আরাকানের বৌদ্ধ রাজার অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রিত। অমাত্য সভায় একদিন আলোচনা হল জায়সির 'পদুমাবৎ' নিয়ে। সভার জ্ঞানীগুণীরা রসাস্বাদন করলেন কাব্যের। আরাকানের জ্ঞানীগুণী সমাজে তখন হিন্দুস্তানি ভাষার কিছুটা প্রচলন থাকলেও সাধারণ্যে এ ভাষা মোটেই প্রচলতি ছিল না। অমাত্য সভার পন্ডিতগণ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের বহুল প্রচার চাইলেন। সাধারণ মানুষও যেন এর রসাস্বাদন করতে পারে। বৌদ্ধ রাজার অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি আলাওল বাংলা ভাষায় রচনা করলেন 'পদ্মাবতী'। এই কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলাওল লিখেছেন—

"গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত নাট যন্ত্র বাহি রঙ্গ ঢঙ্গ করি।।
নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা ছন্দ।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ করিআ আনন্দ।।

একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে।
নানা রস প্রসঙ্গ কহেন্ত গুণিগণে।।
কেহ গাহে কেহ কেহ কহে খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা।
হেন কালে শুনি, পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল পাত্রবর মন।।
কৌতুকে আদেশ কৈলা পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজে যেন অমিয়া বরিষে।।
এহি পদ্মাবতী রসে রচ রস কথা।
হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গোত আন লোকে না বুঝে এ ভাষ।
পয়ার রচিলে পূরে সভানের আশ।
যেহেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল।
লস্কর উজির আশরাফে আজ্ঞা দিল।।
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।
একথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি।।
তাহান আদেশ মাল্য ধরিয়া মস্তকে।
অঙ্গীকার কৈলুঁ মুঞি রচিতে পুস্তকে।।
বিমর্ষি চাহিলুঁ পাছে মুঞি অল্পবুদ্ধি।
কেমনে জানিমু এহি বচনের শুদ্ধি।।
অনেক ভাবিয়' মনে চিন্তিলুঁ উপায়।
তান ভাগ্য যশ কীর্তি আগছএ সহায়।।"

আলাওলের 'পদ্মাবতী' সৃষ্টির উদ্যোগের মধ্যে যেমন আরাকানের অমাত্য সভার বাংলা প্রীতির নিদর্শন নিহিত রয়েছে, তেমনি সেই আমলে যে আরাকানে যথেষ্ট সংখ্যক বাংলাভাষাভাষী ছিলেন সেটাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আরাকানের বিস্তৃত বর্ণনা না দিলেও রাজধানী রোসাঙ্গ এবং রাজ ঐশ্বর্যের কথা তুলে ধরেছেন কবি। সেই সঙ্গে তৎকালীন সমাজ জীবনের কিছু কিছু পরিচয়ও মেলে তাঁর কাব্যে। আরাকান সে সময় এক সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। সৈন্য দলে নাম লেখাবার জন্য তখন আরাকানে অনেকের আগমন ঘটত। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের নাবিক, সওদাগর তাদের বাণিজ্য তরী নিয়ে আরাকানে আসতেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে অনেক বিদেশি আরাকানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। রোসাঙ্গের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আলাওল লিখেছেন—

"নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিসরী শামী তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজ্বেগী সকল।।

লাহুরী মুলতানী হিন্দী                    কাশ্মীরী দক্ষিণা সিন্ধী

কামরূপী আর বঙ্গা দেশী।

ভূপালী কুদংসরী                    কান্নাই মল আবারী

আচি কোচী কর্ণাটকবাসী।।

বহু সৈদ শেখজাদা                    মোগল পাঠান যোদ্ধা

রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।

আভাঈ বরমা শাম                    ত্রিপুরা কুকির নাম

কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি।।

আরমানী ওলন্দাজ                    দিনেমার ইঙ্গারাজ

কাস্তিলাল আর ফরাসিস।

হিসপানী আলমানী                    চোলদার নাসরানী

নানা জাতি আর পর্তুগীস।।"

আলাওলের বর্ণনায় দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তখন নানা প্রয়োজনে অনেক মানুষ এসে আরাকানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মুঘল, পাঠান যোদ্ধা, রাজপুত সবাই আসতেন। এমন কি ত্রিপুরার কুকিদের কথাও আলাওলের বর্ণনায় পাওয়া যায়। নিজের সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য আলাওল তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে দিয়ে গেছেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যে কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

"মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাত জালালপুর পুণ্যবন্ত স্থান।।
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা।
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা।।
মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি।।"

কবি তাঁর জন্মস্থানের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি নিজেকে ফতেহাবাদের অমাত্য-পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এতে বলা যায়, তাঁর জন্মস্থান ছিল ফতেহাবাদ। আর এই ফতেহাবাদ ছিল ফরিদপুর জেলার একটি অংশ। অনেকে চট্টগ্রামকে কবির জন্মস্থান হিসাবে দাবি করার কারণ হিসাবে একটি প্রাচীন মস্‌জিদের কথা বলেছেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ ও দীঘি রয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, আলাওল মস্‌জিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মস্‌জিদের পাশেই ছিল কবির বাড়ি। কিন্তু মস্‌জিদের শিলালিপি সূত্রে প্রচলিত ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায়। শিলালিপিতে রয়েছে আলারাস্তি খান নামে জনৈক ব্যক্তি এই মস্‌জিদটি নির্মাণ করেছিলেন এবং কবি আলাওলের জন্মের অনেক আগেই মস্‌জিদটি নির্মিত হয়েছিল।

কবি আলাওল যে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়ে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং আরাকানে গিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন সে কথা তিনি 'পদ্মাবতী'র আত্মপরিচয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি লিখেছেন—

"কার্যগতি যাইতে পন্থে বিধির গঠন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরসন।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুং এথাত।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুং রাজ আসোয়ার।।"

আরাকান প্রসঙ্গে আলোচনায় বঙ্গোপসাগরে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের তৎপরতা এবং দাসব্যবসা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। কবি আলাওল যখন জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন কর্ণফুলি নদীর পূর্ব উপকূলে দিয়াঙ্গা নামে পোর্তুগিজদের একটি বন্দর ছিল। বস্তুত এই দিয়াঙ্গা ছিল বঙ্গোপসাগরে পোর্তুগিজদের প্রথম ঘাঁটি। এই দিয়াঙ্গা থেকেই পোর্তুগিজ জলদস্যুরা সমুদ্র পথে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাদের আক্রমণ সংঘটিত করত। আরাকানের রাজাও তাদের নিজেদের প্রতিরক্ষার স্বার্থে পোর্তুগিজদের প্রশ্রয় দিতেন এবং দিয়াঙ্গায় পোর্তুগিজ ঘাঁটি সমর্থন করতেন। হয়তো সম্ভাব্য মুঘল অভিযান প্রতিরোধে আরাকানীরা পোর্তুগিজদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। দিয়াঙ্গা ছিল সে সময় বঙ্গোপসাগরে পোর্তুগিজদের দাস ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র। বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে পোর্তুগিজরা লুণ্ঠন, খুন, অগ্নিসংযোগ সহ নানা ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। স্ত্রী লোক সহ শক্ত সমর্থ মানুষ তারা ধরে নিয়ে আসত। তাদের প্রথমে রাখা হত দিয়াঙ্গা বন্দরে। তারপর আরাকানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হত। সেজন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অনুমান, কবি আলাওলকে পোর্তুগিজরা বন্দি করে প্রথমে দিয়াঙ্গা নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে তাকে আরাকান রাজদরবারে পাঠানো হয়। কবি তখন সদ্যযুবক। (পদ্মাবতী/সৈয়দ আলী আহ্সান/স্টুডেন্ট ওয়েজ/ঢাকা-১)।

আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন দীনেশ চন্দ্র সেন। তিনি বলেছেন—"..... হিন্দুদের ঘরের প্রত্যেকটি উৎসব ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হিন্দুসমাজের বাহিরের কোন লোক লিখিতে পারেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইত না-যদি না আমরা এই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতাম। তিনি প্রাকৃত পিঙ্গালের যে সূক্ষ্ম বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা সেই ভাষার কোন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণিকের যোগ্য। তিনি আয়ুর্ব্বেদে এতটা অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন যে, তাহা কোন সাধারণ ভিষগাচার্য্য পারেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত অলংকার শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি নায়িকাদিগের রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুর্গপূজার এত সুবিস্তৃত উপকরণ ও অনুষ্ঠান-রীতির বিবরণ দিয়াছেন যে, আমরা তো দূরের কথা কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্র না ঘাঁটিয়া তাহা বলিতে পারিবেন না।......"

আলাওল ছিলেন বহু ভাষাবিদ্। আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কবি অকারণে বিদেশি ভাষার শব্দ দ্বারা বাংলা ভাষার শ্রী নষ্ট করেন নি বলে উল্লেখ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন। পরবর্তী সময়ের সমালোচকগণ বারংবার আলাওলের

সৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ তথা এক অসাম্প্রদায়িক আবহের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আলাওল আরও যে সব পুঁথি রচনা করেছিলেন সেসব হল—'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', 'হপ্তপয়কর', 'তোহফা', 'দারা সেকান্দারনামা'। এছাড়া দৌলতকাজীর লোর চন্দ্রাণী বা সতী ময়নার পরবর্তী অংশ, যা কাজী শেষ করে যেতে পারেন নি, তা রচনা করেন আলাওল। রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাতেই সব রচিত হয়। 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' রচনার কাজ কবি শুরু করেছিলেন মাগন ঠাকুরের অনুরোধে। কিন্তু পুঁথিটি শেষ করার আগেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তার নয়বছর পর রাজসভার অপর প্রভাবশালী অমাত্য সৈয়দ মুসার অনুরোধে কবি এর দ্বিতীয় অংশ লেখেন। মর্ত্য-প্রেম এই কাহিনির উপজীব্য। আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মুহাম্মদের অনুরোধে আলাওল রচনা করেন তাঁর অপর গ্রন্থ 'হপ্তপয়কর'। এক ইরানি কবির রচনার ভাব অবলম্বনে এটি রচিত হয়। যুদ্ধ ও প্রেম 'হপ্তপয়করেব' উপজীব্য বিষয়। 'তোহফা' হল ইসলামি তত্ত্বোপদেশ। আলাওলের অপর কাব্যগ্রন্থ 'দারা সেকেন্দার নামা' হল একটি ফারসি কাব্যের অনুবাদ। রাজসভার অমাত্য নবরাজ মজলিসের অনুরোধে কবি এটি রচনার কাজ শুরু করেন। পুঁথির শুরুতেই রয়েছে—"হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব। মজলিশ নবরাজ তান মহামাত্য। রোসাঙ্গ দেশত আছে যত মুসলমান/মহাপাত্র মজলিশ সবার প্রধান....." অন্যান্য রচনা থাকলেও 'পদ্মাবতী'ই আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য। ১৬৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দ এর রচনাকাল। অন্যান্য সব কাব্যগ্রন্থ ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবি রচনা করেন। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে কবির মৃত্যু ঘটে। 'পদ্মাবতীর' জন্যই সৈয়দ আলাওল নিজে যেমন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন, তেমনি রোসাঙ্গ রাজসভা ও রাজসভার প্রধান অমাত্য কোরেশী মাঁগন ঠাকুরকেও সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে উজ্জ্বল করে রেখেছেন।

"পদ্মাবতী'র কিছু সংস্কৃতাত্মক পদ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে—

(১) "কুটীল করবী কুসুম-মাঝ।
তারকা মণ্ডলে জলদ-সাজ।।
সূর-শশী দোঁহে সিন্দুর ভালে।
বেড়ি বিধুন্তুদ অলকা-জালে।।
সুন্দরী কামিনী কাম-বিমোহে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে।....."

(২) "প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত
পরভৃত, কুঞ্জেরত বাসে।
মলয়-সমীর, সুসৌরভ, সুশীতল,
বিলোলিত পতি, অতি রস-ভাসে।।
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল দ্রুম,
মুকুলিতা চূতলতা, কোরক-জালে।।"

(৩) "যুবজন-হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত,
রঙ্গালীলা মল্লিকা-মালতী-মালে।
মধু সেনাপতি সঙ্গে, মদন মোহিনী-পতি,
বাহিনী কোরক নবপল্লব-পূর্ণিত।
নবদন্ত কেশর, চামরিনী সৌরভে
ভুবনবিজয়ী চিত্ত, যুবক শাসিত।"

দীনেশচন্দ্র সেন আরও লিখেছেন,—"দৌলতকাজী ও আলাওল প্রভৃতি কবির পুস্তকগুলির আরাকান ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বহুল প্রচলন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষাই এককালে পূর্ব ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এককালে গৌড়দেশ বৌদ্ধ ধর্মের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল। গৌড়ের পাল নৃপতিরা বাঙ্গালি ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা অক্ষর পূর্বে ভারতীয় উপদ্বীপসমূহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। শ্যামদেশে বাঙ্গালা রূপকথাগুলি যাইয়া সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল।"

৬

'পদ্মাবতী' রচনার পর সৈয়দ আলাওল মাগন ঠাকুরের আদেশে রচনা করেন 'সয়ফলমূলক বদিউজ্জামাল'। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে রাজা থদোমিন্তারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শ্রীচন্দ্র সুধর্মা। প্রয়াত রাজা থদোমিন্তারের রানি অর্থাৎ রাজমাতা তখন পুত্রের পক্ষে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি মাগন ঠাকুরকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আলাওল উল্লেখ করেছেন—

"নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী।
সাদউ মেঙ নৃপের ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী।।
সাদউ মেঙদার যদি গেল পরলোকে।
ব্রতধর্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে।।
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নৃপতিক শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হৈল একমুখী।।
দণ্ডবৎ হইয়া মহাদেবীর গোচর।
কহিতা লাগিলা সবে বিনয় উত্তর।
শিশু নৃপে কেমনে পালিব বসুমতী।
পুত্রে রাজা করিয়া আপনি পাল ক্ষিতি।।......"

আলাওল রাজা নরপতিগ্রীকে কাব্যে নৃপতিগিরি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই নরপতিগ্রী বা নৃপতিগিরির পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল রাজারই ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমিন্তারের।

রোসাঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল 'সয়ফলমূলক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনার কাজ শেষ করার আগেই মৃত্যু ঘটে মাগন ঠাকুরের। স্বাভাবিকভাবেই পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায় পুঁথি রচনার কাজ। পরবর্তী সময়ে রোসাঙ্গ রাজসভার অপর এক অমাত্য সৈয়দ মুসার আদেশে আলাওল এই কাব্য রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। কিন্তু

এর মধ্যে নদী দিয়ে গড়িয়ে যায় অনেক জল। উল্লিখিত কাব্যটি রচনার কাজ শেষ হওয়ার আগেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু, সুজার আরাকান আগমন, আরাকানের রাজার সঙ্গে সুজার বিরোধ, সঙ্গীসাথীসহ সপরিবারে সুজার হত্যাকাণ্ড, মির্জা নামে এক কুলোকের ষড়যন্ত্রে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে কবির কারাবাস ইত্যাদি নানা ঘটনার ঘনঘটা যেন মধ্যযুগের আরাকান ইতিহাসের উপাদান হয়ে আছে। পরবর্তী সময় মুসার আদেশে আলাওল যখন অসমাপ্ত 'সয়ফলমূলক বদিউজ্জামাল' সমাপ্ত করেন তখন এতে সুজার ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত হয়।

দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রাণী বা সতী ময়না' কাব্যটি কবি আলাওল সমাপ্ত করেন। কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ কাজী লিখে গিয়েছিলেন। কবির মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর বাকি এক অংশ লিখেন আলাওল।

সৈয়দ আলাওল রচিত 'হপ্তপয়কর' কাব্যে রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার কথা, সুজার আরাকান আগমনের কথা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সুজার অন্তিম পরিণতির কথা নেই। কাব্যটি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া কবি উপদেশমূলক ধর্মগ্রন্থ 'তোহফা' রচনা করেন। কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সিকান্দারনামা'। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে এটি রচিত বলে মনে করা হয়।

আরাকান অর্থাৎ রোসাঙ্গের অপরাপর কবিদের মধ্যে কাজীর সমসাময়িক হলেন কবি মর্দন, সমসের আলী। এছাড়াও রোসাঙ্গের মোহাম্মদ খান, আব্দুল নবি, সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর, মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ রফিউদ্দিন, সেখ সাদী, শের রাজ, আবদুল আলিম, আব্দুল হাকিম প্রমুখ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সংযোজন করেছেন তাদের সৃষ্টি সম্ভার। (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান/আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য/রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস/বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।)

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা নিয়ে অর্ধ শতাব্দীকাল আগে থেকেই গবেষণা হচ্ছে। সাহিত্য-বিশারদ আব্দুল করিম ও এনামুল হকের 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামের আকর গ্রন্থটি সূত্রেও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এখনও তা অব্যাহত বললে ভুল হবে না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন গবেষণা, নতুন আবিষ্কার, নতুন চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটছে। সাম্প্রতিক কালে যেমন বলা হচ্ছে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা কথাটাই ভুল। কারণ রাজসভায় নয়, বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়েছিল আরাকানের অমাত্য সভায়। রাজানুগ্রহ নয়, দৌলতকাজী, আলাওল প্রমুখ কবিগণ কাব্য চর্চা করেন আরাকানের মুসলমান অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ঢাকার বাংলা একাডেমি পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯০) আহমদ সরীফ বলেন—"কাজী দৌলত, আলাওল প্রমুখ রচিত সাহিত্যকে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করা কিংবা কাজী দৌলত ও আলাওলকে রোসাঙ্গ রাজসভার কবি বলে অভিহিত করা অসঙ্গত।"

কিন্তু রাজাদের নীরব সমর্থন ছাড়া রাজার অমাত্যদের পক্ষে কাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা আদৌ সম্ভব ছিল কী? ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এটা দেখা গেছে যে, রাজার সায় নেই— এমন কোনো কাজে মন্ত্রীরা কিংবা অমাত্যবর্গ এগিয়ে আসে নি কোনো কালে। আরাকান বা

রোসাঙ্গ ব্যতিক্রম হবে কী ভাবে? সর্বোপরি দীর্ঘকালব্যাপী আরাকানে কাব্যচর্চা হয়েছে অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কবিগণ তাঁদের রচনায় অমাত্যদের সঙ্গে রাজার রাজত্বকাল, রাজার বন্দনা, বৈভব, গুনগান ইত্যাদিও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজমন্ত্রী, অমাত্যগণ যে কাব্য রচনার নির্দেশ দিয়েছেন-কাব্যে তারও উল্লেখ করেছেন। রোসাঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমান অমাত্যদের আন্তরিক আগ্রহের ফলশ্রুতি এই কাব্য সমূহ এটা যেমন ঠিক, তেমনি তাতে যে রোসাঙ্গের রাজাদের সায় ছিল এটাও অস্বীকার করা যায় না। তাই রোসাঙ্গের রাজসভায় না অমাত্য সভায় সপ্তদশ শতকে কাব্যচর্চা হয়েছিল সে বিষয়ে আজ বিতর্কের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

'চন্দ্রাবতী' কাব্যের স্রষ্টা মাগন ঠাকুর নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। আবিষ্কৃত 'চন্দ্রাবতী'র এক খন্ডিত পুস্তকে ভণিতায় কোরেশী মাগন-এর নাম রয়েছে। পরবর্তী সময়ের গবেষকগণের কেউ কেউ বলেছেন, রোসাঙ্গ রাজসভার অমাত্য মাগন ঠাকুর আর 'চন্দ্রাবতী'র কবি কোরেশী মাগন এক ব্যক্তি নন। কোরেশী মাগন আদৌ রোসাঙ্গে বসে কাব্যচর্চা করেছিলেন কিনা তাও নিশ্চিত নয়। চট্টগ্রামের নওয়াজিশহর থেকে আবিষ্কৃত 'চন্দ্রাবতী' খন্ডিত পুঁথিখানিতে কবির আত্মপরিচিতি, রচনা তারিখ কিছুই পাওয়া যায়নি। গবেষকগণ বলেছেন— কবি তাঁর কাব্যে ভণিতায় কোরেশী মাগন বা মাগন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঠাকুর শব্দ ব্যবহার করেন নি। যেমন---'রচিল পঞ্চালী ছন্দ কোরেশী মাগন।' কিংবা 'চন্দ্রাবতী তোর নারী কহিল মাগন। সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ আরও বলেছেন যে, 'পদ্মাবতীর' কবি সৈয়দ আলাওল তাঁর কাব্যে কোথাও উল্লেখ করেননি যে, অমাত্য মাগন ঠাকুর কবি ছিলেন। এই মাগন ঠাকুর 'চন্দ্রাবতী'র কবি হলে কাব্যে তিনি অবশ্যই রোসাঙ্গের রাজার নামও উল্লেখ করতেন। (আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক বক্তৃতা রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য/বাংলা সাহিত্য সমিতি/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।)

৭

আরাকানের ইতিহাস নিয়ে ইতিমধ্যে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। গৌড় বাহিনীর সহায়তায় যুবরাজ নরমিখলা আরাকানে পিতৃ সিংহাসন অধিকার করে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ম্রাউক-উ রাজবংশ। লেম্রো নদীর তীরে রাজধানী করেছিলেন ম্রোহং। তখন থেকে গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল আরাকান। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত একশো বছর স্থায়ী ছিল এই ব্যবস্থা। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে ম্রাউকউ বংশের রাজপুত্র জেবুক শাহ ম্রোহং-এর সিংহাসনে বসে ছিন্ন করেন গৌড়ের আধিপত্য। তখন গৌড়ের পতনের সূচনা ঘটেছে। জেবুক শাহ আরাকানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ম্রাউক-উ বংশের অপর রাজা সেলিম শাহ বঙ্গাদেশের নিম্নাংশ থেকে ব্রহ্মদেশের মলমিন পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করে নিজেকে নাকি "বাদশাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী আরাকানকে মুঘলদের পর দ্বিতীয় শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন ফরাসি পরিব্রাজক ফাইয়ারড।

উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা অনুমান করতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে, একদা পূর্ব প্রান্তের আরাকান হয়ে উঠেছিল প্রবল শক্তিধর। ভাগ্যান্বেষণে অনেকে সে দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

পোর্তুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় মগদের নিয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে উঠার পর কালক্রমে মগদের দস্যুবৃত্তি হয়তো আরাকানের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। মগদস্যুদের তাণ্ডবে একদা নিম্নবঙ্গে নেমে এসেছিল শ্মশানের স্তব্ধতা। লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদির পাশাপাশি নারী, পুরুষ, নির্বিশেষে বঙ্গাদেশের মানুষ ধরে নিয়ে যেত তারা। তারপর আরাকানে ক্রীতদাস হিসাবে তাদের বিক্রি করা হত।

বঙ্গোপসাগরে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের তৎপরতা নানাভাবে প্রান্তীয় রাজ্যসমূহের ইতিহাসে প্রভাব ফেলেছে। প্রসঙ্গাতঃ ত্রিপুরার কথাও উল্লেখ করা যায়। ত্রিপুরার রাজাও পোর্তুগিজদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আরাকানের মগ রাজার সঙ্গো যুদ্ধে পোর্তুগিজ সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় ত্রিপুরার রাজার পরাজয় ঘটেছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন অমরমাণিক্য। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরার সঙ্গো আরাকান রাজ্যের অনেক আগে থেকেই যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছিল। অমরমাণিক্য ছিলেন মধ্যযুগের ত্রিপুরার এক বীর নৃপতি। সিংহাসনে বসেই তিনি সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। ষোড়শ শতকে বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ দ্বীপে পোর্তুগিজ জলদস্যুরা ঘাঁটি গেড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহে ব্যাপক হারে দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছে তখন। আরাকান রাজা এই পোর্তুগিজদের নিয়ে একটি নৌবাহিনী গঠন করেছেন। ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য তখন আরাকানিদের সঙ্গো পাল্লা দেবার জন্য দুর্ধর্ষ পোর্তুগিজদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ত্রিপুরার পরাজয় ত্বরান্বিত হয়।

আরাকানীদের সঙ্গো অমরমাণিক্যের এই যুদ্ধ সম্পর্কে ত্রিপুরার ইতিহাস সূত্রে জানা যায় আরাকান রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত প্রভু আদম শাহের সঙ্গো তীব্র বিবাদ হয় আরাকানপতি মাংফ্লাং-এর। আদম শাহ তখন ত্রিপুরায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অমরমাণিক্যের সঙ্গো আরাকানরাজের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। আরাকান থেকে প্রথমে দূত আসে ত্রিপুরার রাজার দরবারে। আদম শাহকে তাদের হাতে তুলে দিতে আরাকানরাজা অনুরোধ জানান। কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখাত হয়। অবশেষে ঘনিয়ে আসে যুদ্ধ। প্রথম দিকে যুদ্ধে সাফল্য আসলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরাজয় ঘটে ত্রিপুরার। অমরমাণিক্য রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। আরাকানের মগবাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর দখল করে ব্যাপক হারে লুণ্ঠন চালায়। ত্রিপুরার পাঠান ও পোর্তুগিজ সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও রাজপুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ এই যুদ্ধে ত্রিপুরার শোচনীয় বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। আরাকানের রাজা কৌশলে রাজপুত্রদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁর এই কৌশলের মাধ্যম ছিল একটি মুকুট। আরাকানরাজ প্রেরিত মণিমুক্তাখচিত হস্তিদন্তের অপূর্ব মুকুটটি নিয়ে অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও। প্রভুদের কীর্তি দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়ে সৈন্যদল। এই সুবর্ণ সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরা শিবির আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেন। এরপর আর ত্রিপুরার বাহিনী ঘুরে দাঁড়াতে পারে নি। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার রাজপরিবারে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' গল্প ও নাটক রবীন্দ্র সাহিত্যে ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। আরাকান রাজা প্রেরিত এই 'মুকুট' সম্পর্কে রাজমালার সারসংকলক Rev. James

Long সাহেব লিখেছেন—"On this the king of Mugs wished to make peace and sent the brothers a crown of ivory as a present, a dispute arose among them as to who should possess it, and one who lost it abused the Mugs" (Journal of Asiatic Society of Bengal Vol. XIX)

সেই যুগে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরার সঙ্গে আরাকানীদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত বলা যায়। কখনও আরাকানরাজ চট্টগ্রাম জয় করে নিতেন, কখনও ত্রিপুরা আবার তা ছিনিয়ে আনত। অমরমাণিক্যের আগে বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৩২—১৫৬৩) চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরার সঙ্গে গৌড়বঙ্গ এবং আরাকানের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়েছে। বিখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক রালফ্ ফিচ্ বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর বছরে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন—"সাত গাঁও হতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। রাক্ষিয়াং ও রাম্বুবাসী মগদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতির দুর্বলতা চট্টগ্রাম বা পোর্টোগ্রাণ্ডো বারংবার রাক্ষিয়াং (আরাকান) রাজার হস্তগত হয়। [From Satagan I travelled by the country of the king of Tippera, with whom the Mogen have almost continual wars. The Mogen which of the kingdom of Recon and Rame, be stronger than the king of Tippera. So that chitagan, or Portogrando, is often times under the king of recon (Ralph Fitch)]

বিজয়মাণিক্যের আগে ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকালেও (১৪৯০-১৫২০) চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে ত্রিপুরা প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন—"ধন্যমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মগ এই জাতিত্রয়ের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল....।" গৌড় সুলতান হুসেন শাহ্, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরাই জয়লাভ করেছিল বলে কৈলাসবাবু উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন —"সেনাপতি চয়চাগ হুসেন সাহের গর্ব খর্ব করিয়া মগদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। তিনি মগদিগকে বারংবার পরাজিত করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত করেন।"

ত্রিপুরার ইতিহাস সূত্রেও দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকে চট্টগ্রাম নিয়ে আরাকানীদের সঙ্গে ত্রিপুরার বারংবার যুদ্ধ হয়েছে।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ অনুসারে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ষোড়শ শতকে আরাকান এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস /শ্রীরাজমালা/রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা।)

রোসাঙ্গ রাজসভার কবিদের বর্ণনাতেও আরাকানের সমৃদ্ধ রূপটিই ফুটে উঠেছে। সপ্তদশ শতকে কবি দৌলতকাজী তাঁর 'লোর চন্দ্রাণী বা সতী ময়না' কাব্যে আরাকান রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন রাজার নাম শ্রীসুধর্ম। রাজার অনেক হাতি ঘোড়া, বিপুল বৈভব। দৌলতকাজীর বর্ণনায়—"অযুতে অযুতে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা। কনে বা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা।।' সে সময় আরাকানে যে মুঘল, পাঠান এবং আরব দেশের

লোকের বসবাস ছিল তাও কবির লেখায় প্রতিফলিত হয়—"বিদেশী আরবী রূমী মোগল পাঠান। পালেন্তে সে সবে যেন শরীর সমান।" রাজার রাজকীয় বৈভবের কথা কবি এই ভাবে ব্যক্ত করেন—"এক দিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম রাজার। সসৈন্য সমস্ত চলে বিপিন-বিহার।। ধবল অরুণ কালা লাল বর্ণ গজ। আকাশ ছাইয়া চলে নানা বর্ণ ধ্বজ।" আরাকান রাজার সমরসচিব লস্কর উজির আশরাফ খানের অনুরোধ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলতকাজী 'লোর চন্দ্রাণী বা সতীময়না' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাজী তাঁর কাব্যে আশরাফ খানের দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"শ্রী আশরাফ খান লস্কর উজির। যাহার প্রতাপ বজ্রে চূর্ণ অরি শির।"

এখানে উল্লেখ্য, ডাচ ব্যবসায়ীরাও তাদের বিবরণে এক প্রতিপত্তিশালী লস্কর উজিরের কথা উল্লেখ করে গেছে। একটি চুক্তির মাধ্যমে তদানীন্তনকালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আরাকানের রাজধানী 'ম্রোহং'-এ একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। কিন্তু লস্কর উজিরের কঠোর ব্যবস্থায় তাদের ব্যাবসাবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এছাড়া ডাচরা আরাকানে তাদের বিবাহিত স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন না। তখন এমন একটা নিয়ম সেখানে প্রচলিত ছিল যে, কোনো বিদেশি যতদিন ইচ্ছা আরাকানে বসবাস এবং আরাকানি নারীকে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু স্বদেশ যাবার সময় আরাকানি স্ত্রী ও সেই স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। এমনকি কোনো কোনো বিদেশি তাদের স্ত্রী সন্তানদের মটকায় লুকিয়ে জাহাজে তোলারও চেষ্টা করত। কিন্তু লস্কর উজিরের বাহিনীর তৎপরতায় তাও সম্ভব হত না। শেষ পর্যন্ত ডাচরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য রাজা শ্রীসুধর্মার কাছে আবেদন করেও প্রত্যাখ্যাত হয়। এমনই প্রতাপান্বিত ছিলেন লস্কর উজির আশরাফ খান। বস্তুত সে সময় আরাকানের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ছিলেন তিনি। শ্রীসুধর্মা ছিলেন নামেই রাজা। রাজা হলেও তাঁর আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হতে পারেনি জ্যোতিষীর ভবিষৎবাণীর জন্য। রাজজ্যোতিষী জানালেন, ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে রাজার মৃত্যু হবে। রাজমাতা সে জন্য রাজ্যাভিষেক বন্ধ করে দিয়ে লস্কর উজির আশরাফ খানের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেছিলেন। যাই হোক, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে রাজা শ্রীসুধর্মা ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হয়েছিলেন।

কিন্তু কেমন ছিল সেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র? কে বা কারা ছিলেন ষড়যন্ত্রী? রাজা শ্রীসুধর্মার পত্নী ছিলেন এর মধ্যমণি। নরপতিগ্রী রাজারই এক জ্ঞাতি ভ্রাতা। প্রাসাদের অলিন্দে তখন ফিসফাস গুঞ্জন। প্রবল প্রতাপান্বিত লস্কর উজির আশরাফ খানও তখন আর স্বপদে নেই। লস্কর উজির পদে নতুন মুখ। চরম বিপর্যয় যে ঘনিয়ে আসছে রাজা যেমন তাঁর সামান্য আঁচও পান নি, সম্ভবত অমাত্যগণও টের পাননি তা। রানি তাঁর প্রেমিক রাজভ্রাতা নরপতিগ্রীর সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করে রাজা সুধর্মকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন। হত্যা করালেন। রানী বসলেন সিংহাসনে। তারপর? মাত্র কয়েকমাস পরে রানিকে হটিয়ে দিয়ে রাজা হয়ে বসলেন নরপতিগ্রী। এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে থাকল লেম্রো নদী।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসে নরপতিগ্রী ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নরপতিগ্রীর মৃত্যুর পর রাজা হলেন থদোমিন্তার। পদ্মাবতীর কবি সৈয়দ আলাওলকে যখন আরাকানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে দেশের রাজা ছিলেন

থদোমিন্তার (১৬৪৫—১৬৫২)। থদোমিন্তারের পর সিংহাসনে বসেন চন্দ্র সুধর্মা। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৫২-১৬৮৪। এই চন্দ্র সুধর্মার রাজত্বকালেই ঔরঙ্গজেবের ভয়ে সুজা পালিয়ে এসেছিলেন আরাকানে। শেষ পর্যন্ত নৃশংসভাবে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন তিনি। সুজার হত্যাকাণ্ডের পর আরাকানে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ঘটে ছিল মুঘল আক্রমণ। অবশ্য সুজার ঘটনা নিয়ে প্রাপ্ত তথ্যে রয়েছে পরস্পর বিরোধিতা। শুধু আরাকান কেন, ত্রিপুরার ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন সুজা। কেউ বলেছেন ত্রিপুরা চট্টগ্রাম হয়ে সুজা সপরিবারে আরাকান গিয়েছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, ঢাকা থেকে জলপথে তিনি সরাসরি সেখানে গিয়েছিলেন।

সম্রাট শাহাজাহানের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। শাহাজাহানপুত্র সুজা ছিলেন সুবে বাংলার শাসনকর্তা। সেজন্য বাংলার প্রান্তীয় এলাকাসমূহ সেদিন মুঘলদের এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের আঁচ পেয়েছিল। এলাহাবাদের ৩০ মাইল দূরে কিরাগার যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর কাছে সুজা পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের বাহিনী সেখানেও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। সুজা তারপর রাজমহল, তারা নগর হয়ে ঢাকাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু নিস্তার নেই ঢাকাতেও। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে সুজা ত্রিপুরার অরণ্যাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আরাকানে চলে গেলেন। এদিকে সুজা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন এই সংবাদের ভিত্তিতে ঔরঙ্গজেব সুজাকে তাঁর হাতে প্রত্যর্পণের জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে একটি পত্র লেখেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, এই পত্রটি ত্রিপুরায় পৌছার পূর্বেই সুজা আরাকান পৌছে গিয়েছিলেন।

ফরাসি পর্যটক বর্নিয়ার উল্লেখ করেছেন যে, সুজা ঢাকা থেকে জাহাজে করে আরাকান পৌঁছেছিলেন। আবার মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, সুজা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আরাকানে গিয়েছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বক্তব্য এক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন, সিংহাসনচ্যুত ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য তখন চট্টগ্রামের পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করছিলেন। সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটি থেকে পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে গোবিন্দমাণিক্যের বাসভবনে উপস্থিত হলে তিনি সুজাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেন। বিদায়ের সময় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সুজা নিজের ব্যবহারের বহুমূল্য 'নিমচা' তরবারি ও একটি হীরকাঙ্গুরীয় গোবিন্দ মাণিক্যকে উপহার দিয়ে যান। (রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস)

আরাকানে সুজার হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন, সুজার অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে আরাকানরাজ বিবাহ করতে চেয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে সুজার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুজা ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুজার জীবদ্দশায় মনোবাসনা পূর্ণ হবে না জেনে আরাকানরাজ প্রচার করে দেন যে, সুজা কৌশলে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করতে এসেছেন। তাই অবিলম্বে তাঁর প্রাণবধ প্রয়োজন। কিন্তু বিনাযুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধদের ধর্মবিরুদ্ধ। সে জন্য সুজাকে নৌকায় বেঁধে জলে ডুবিয়ে মারা হয়। সুজাপত্নী পরিভানু ও দুই কন্যা আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সুজার তৃতীয় কন্যার স্থান হয় মগরাজার অন্তঃপুরে। ফরাসি

পর্যটক বর্নিয়ার লিখে গেছেন, সুজা তাঁর বংশ গৌরব রক্ষায় বীরের মতো যুদ্ধ করেন। আবার 'শ্রীরাজমালায়' এর বিপরীত বক্তব্য রয়েছে। তাতে রয়েছে সুজা আরাকান রাজের কন্যাকে বিবাহ করে সেখানে বাস করছিলেন। কিন্তু শ্বশুরকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেন তিনি।

যেমন— "রসাঙ্গের রাজকন্যা বাদসা বিবা কৈল।
সেই কালে সুজা বাদসার কুবুদ্ধি জন্মিল।।
রসাঙ্গের রাজা বধ করিতে যতন।
চল্লিশ জন মল্ল আনি করে নিয়োজন।।"

(শ্রীরাজমালা, গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড)

'শ্রীরাজমালায়' রয়েছে যে, সুজার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। তাঁর সৈন্যগণ নিহত হয়। কিন্তু সুজা পালিয়ে যান। সুজার আচরণ আরাকানরাজকে তাঁর রাজ্যে বিশিষ্ট বিদেশিদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার সিংহাসনচ্যুত রাজা গোবিন্দমাণিক্য তখন আরাকানে আশ্রিত ছিলেন। সুজার ঘটনার পর আরাকানরাজ নানা উপহারসামগ্রী দিয়ে ত্রিপুরার রাজ্যচ্যুত রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বিদায় জানান। গোবিন্দমাণিক্য অনুচরবর্গ সহ চট্টগ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ত্রিপুরার সিংহাসনে তখন রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য। তাই ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি তাঁর। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর অবশ্য গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরায় ফিরে যান। (শ্রী রাজমালা)

সুজার হত্যাকাণ্ড সপ্তদশ শতকের আরাকান ইতিহাসকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই ঘটনার সূত্রে মুঘল আক্রমণ ঘটে আরাকানের বিরুদ্ধে। ঔরঙ্গজেব সুজাকে পেলে হয়তো হত্যা করতেন, কিন্তু বিদেশে ভ্রাতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড তাকে বিচলিত করে। তিনি বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খানকে প্রতিশোধ নিতে নির্দেশ দেন। শায়েস্তা খান অভিযান চালিয়ে মগদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। মগদের শক্তি প্রবলভাবে হ্রাস পায়। আরাকানে নানা অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বস্তুত সুজার হত্যাকাণ্ডের সূত্রেই যেন সমৃদ্ধ আরাকানের পতনের সূচনা ঘটে।

রোসাঙ্গের কবিদের বর্ণনাতেও ইতিহাসের আঁচ পাওয়া যায়। সেজন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোসাঙ্গের কবিদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনায় আরাকান সহ সমকালীন বাংলা ও প্রান্তীয় বাংলার ইতিহাস যেন ভেসে ওঠে। সুজা কাহিনি তাই প্রাসঙ্গিক। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা, আরাকান, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার ইতিহাস।

সুজার হত্যাকাণ্ডের সময় সৈয়দ আলাওল রোসাঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর "সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল" কাব্যে সুজার হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এজন্য তিনি সুজাকেই দোষ দিয়েছেন। আলাওল বলেন—

"তার পাছে শাহ সুজা নৃপকুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর।।
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হোন্তে পাইল অবসাদ।।

যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হইল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহু লোক মৈল।।
মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্ম ভ্রষ্ট।
নিগ্রহ করিয়া বহু লোক করে নষ্ট।।........"

আলাওলের বর্ণনা মতো জানা যায়, সুজার সঙ্গে যত মুসলমান আরাকান গিয়েছিল তাদের সবাই নিহত হয়েছিল। কবি লিখেছেন যে, দৈব দুর্বিপাকে সুজা রোসাঙ্গে গিয়ে নিজ দোষে সেখানকার রাজা কর্তৃক শাস্তি পান এবং সঙ্গীসহ নিহত হন। সুজার সঙ্গে রোসাঙ্গরাজার বিবাদের কথা জানালেও, কিম্বা সুজার নিজ দোষের কথা উল্লেখ করলেও—কেন তাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছিল, সুজার দোষই বা কি ছিল-তা কিন্তু 'পদ্মাবতী'র কবি আলাওল উল্লেখ করেননি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য অনেক বিশ্লেষক এই অভিমত দিয়েছেন যে, ইচ্ছা থাকলেও আরাকানের রাজকর্মচারী তথা রাজসভা আশ্রিত কবি আলাওলের পক্ষে তা মোটেই সম্ভব ছিল না। কবি অবশ্য 'মির্জা' নামে একজন বদ্ লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যে কিনা মিথ্যা অভিযোগ করে অনেক লোককে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়েছিল। এই "ধর্মভ্রষ্ট" "পাপী" লোক মির্জা কবি আলাওলকেও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এবং কবি পঞ্চাশ দিন কারাবাস করেন। আলাওল লিখেন—

"আম্মারেহ অপরাধ দিল পাপীছারে।
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে।।
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ।
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস।।"
(সয়ফলমূলক বদিউজ্জামাল)

আরাকান রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল 'সয়ফল মূলক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা শুরু করেন। কিন্তু তা শেষ করার আগেই মৃত্যু ঘটে মাগন ঠাকুরের। পুঁথি রচনাও বন্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে রোসাঙ্গের অপর এক অমাত্য সৈয়দ মুসার আদেশে আলাওল তাঁর অসমাপ্ত কাব্য রচনার কাজ শেষ করেন। কাব্যের শেষ পর্যায়ে সুজার ঘটনা বর্ণনা করেন তিনি। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সুজা রোসাঙ্গে পৌছান। তাঁর ৯ বৎসর পর এই কাব্য রচনা শেষ হয়।

আলাওলের শেষ কাব্য হল "সিকান্দর নামা"। সুজার আগমনের দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এটি রচিত হয় বলে অনুমান করা হয়। কবি এই কাব্যেও সুজার কথা এবং মিথ্যা অপবাদে তাঁর নিজের কারাবাসের কথা উল্লেখ করেছেন—

শাহ সুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্র সব দিল হতমতি।।
আপনার দোষ হোন্তে পা এ অবসাদ।
এক পাপী আম্মারেহ দিল মিথ্যাবাদ।।
কারাগারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হইল ছারখার।।"

সুজা উপাখ্যান বিষয়ে আলাওল বিস্তৃত আলোকপাত না করলেও তিনি যেটুকু বর্ণনা করেছেন তাতে ঘটনার গভীরতা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সমস্ত সঙ্গী সহ সুজার নিহত হবার কথা জানান তিনি। "তবে আপনার দোষ" অর্থাৎ সুজা নিজের দোষেই শাস্তি পেলেন—এক্ষেত্রে সুজার দোষটা কী ছিল তা কবি উল্লেখ করেননি, ইঙ্গিতও দেননি। সুজার কন্যাকে আরাকানের তরুণ রাজার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করাটাই কি সুজার দোষ ছিল? কবি অবশ্য এক কুচক্রীর কথা উল্লেখ করেছেন—যার নাম মির্জা। সুজার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন অভিযোগ করে সে অনেক লোকের সর্বনাশ করেছে। এমনকি কবিকেও কারাবাস করিয়েছে।

যাই হোক, কবি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান এবং কাব্য রচনা সহ তাঁর অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন।

সুজার আরাকান আগমন সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, মীরজুমলার কাছে পরাজিত হয়ে তিনি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে আরাকানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৬ আগস্ট সুজা আরাকান রাজধানী রোসাঙ্গে পৌঁছেন। মিরজুমলা সুজাকে তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য ডাচ কুঠিয়ালদের মাধ্যমে আরাকান রাজার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এতে মিরজুমলার সঙ্গে আরাকান রাজের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং যুদ্ধের উপক্রম হয়। আরাকানের রাজা চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করেন। নৌবাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি করা হয়। সুজার উদ্দেশ্য ছিল সপরিবারে মক্কাশরীফে যাওয়া এবং সেখান থেকে তুরস্ক বা ইরানে চলে যাওয়া। শীত মরশুমে উপযুক্ত জাহাজের ব্যবস্থা করে সুজাকে মক্কায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন বলেও আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মা আশ্বাস দেন। কিন্তু তার আগেই রাজার সঙ্গে সুজার বিবাদ শুরু হয়ে যায়। রাজার আদেশে সপরিবারে নিহত হন সুজা।

কবি আলাওল সুজার হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করলেও বিস্তৃত বিবরণ দেন নি। তবে তদানীন্তন সময়ের ডাচ কোম্পানির রেকর্ড সূত্রে জানা গেছে, সুজাকে ও তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল। রোসাঙ্গে তখন বিদেশি বণিকদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সুজার শেষ পরিণতির কথা যাতে বিদেশিরা না জানতে পারে সেজন্য সমস্ত বিদেশি জাহাজকে বন্দর ছেড়ে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রায় সান্ধ্য আইন জারির মতো ব্যবস্থা নিয়ে সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে সুজাকে হত্যা করায় প্রথমে প্রকৃত অবস্থা কেউ জানতেই পারেনি। এরকম অবস্থায় রাজসরকারের কর্মচারী হয়ে আলাওলের পক্ষে ঘটনার প্রায় এক দশক পরও আমাদের আর কতটা জানানো সম্ভব? (সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৭৪ বাং, ঢাকা। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক বক্তৃতা, রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, এন.এম. হাবিবউল্লাহ, ঢাকা।)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় রোসাঙ্গ বা আরাকান অপরিহার্য। কালক্রমে সেখানে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বসতি পত্তন হয়েছিল। এদের কেউ কেউ রোসাঙ্গ রাজসভার উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ছিলেন সমর সচিব, অমাত্য, মুখ্যমন্ত্রী। আর এইসব বাংলা ভাষী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে এক বেগবান ধারার